চিন্তন

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

সহযোগিতা ঃ-
শ্রী কমল চক্রবর্ত্তী
অনির্বাণ, দেবতনু

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১০
৯ই পৌষ, ১৪১৭

মুদ্রণ
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
infoavinabadarshan@gmail.com
Website : www.avinabadarshan.com (Free Site)

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
২) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য ঃ- দশ টাকা মাত্র

পূর্বাভাষ

এই পরিদৃশ্যমান জগতে সৃষ্টির মাঝে চলেছে শুধু রূপের খেলা। রূপে রূপে পরিবর্ত্তনের মাঝেই চলেছে এই সৃষ্টির ধারা। যে শক্তির প্রভাবে একের পর এক সৃষ্টি হয়ে চলেছে তার আদি শক্তি হচ্ছে মন। জগতে প্রতিটি বস্তুর মাঝে মনেরই প্রকাশ। এই পরিদৃশ্যমান জীবজগত মনন শক্তির সাথে এমনভাবে মিশে রয়েছে যে, আলাদাভাবে খুঁজতে গেলে খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ জীবজগতের প্রতি অণু-পরমাণুতে, প্রতি বিষয় বস্তুতে মন বিদ্যমান। এক একজনের মনের চিন্তাতে, মনের মাত্রা অনুযায়ী নব নব সৃষ্টি হয়ে চলেছে। শত সহস্র কোটি জীবের শত সহস্র কোটি রূপ, মনন শক্তিরই রূপ, মনের স্ফুরণেই সব কিছুর সৃষ্টি। মনই হচ্ছে মন্ত্রশক্তি, মনই হচ্ছে সপ্তচক্র। আবার মন হচ্ছে যার যার আরাদ্ধ দেবতা। তাই মনই স্রষ্টা, মনই ভগবান, আল্লা, গড্। মনন আকারে স্রষ্টা স্বয়ং সবার মাঝে নির্বিকল্প অবস্থায় গভীর সমাধিতে সমাহিত হয়ে আছেন।

জীব, মুক্ত হয়েই পৃথিবীতে আসে। এখানে এসে কর্মদোষে জড়িয়ে ফেলে নিজেকে। মন বসে না, মন চঞ্চল - একি শুধুই কর্মদোষ? না সংসারের আবিলতা, ঝামেলার ফল। মন চঞ্চল, মন বিক্ষিপ্ত, মন উড়ো উড়ো - এইগুলি মনের বহুমুখী শক্তিরই প্রকাশ। বিক্ষিপ্ত মন canal-এর মতো আঁকা বাঁকা পথে চলেছে শুধু মহাসাগরের সান্নিধ্য পাবার আশায়। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী যার মন যত বেশী বিক্ষিপ্ত, সে তত বেশী বিরাটের সুরে যুক্ত রয়েছে, আর সে তত বেশী খাঁটি।

প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের শক্তি মনেরই শক্তি। যদি একটি সরিষা আর পৃথিবী একই সূত্রে গাঁথা থাকে, তবে চিন্তার সাথে সাথে, মননের সাথে সাথে পৃথিবী পরিক্রমা হয়ে যায়। জগতের সমস্ত বস্তুর সাথে, সমস্ত জীবের সাথে আমাদের সত্তা বাঁধা ও গাঁথা আছে বলেই মনন করার সাথে সাথে আমরা কত কি দেখছি, কত কি শুনছি। একই মনন শক্তি একবার চোখে, একবার কানে, একবার জিহ্বায় প্রকাশিত হচ্ছে।

এই মন বসাবার জন্য, মন স্থির করার জন্য অনেক সাধু গুরু মহান, অনেক উপদেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু আজও মনের কি কাজ, মন যে কি করছে কোন আখ্যায় ব্যাখ্যায়, কোন সীমার বাঁধনে মনকে বেঁধে রাখা যাচ্ছে না। কারণ মন এত বিরাট, মনের গতি এত প্রচণ্ড (দ্রুত) যে সে (মন) এক পলকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মাইল দূরে চলে যাচ্ছে। তার চলার পথে জল, আগুন, বাতাস কোন কিছুই বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না; তাই সেই মনকে কি কোন উপদেশ, কোন আখ্যায় ব্যাখ্যায় বা কোন সীমার বাঁধনে বেঁধে রাখা যায়?

মনটা একটা বস্তু। সুতরাং এই মনকে যদি তার উপযুক্ত খোরাক না দেওয়া হয় তবে সে তো ভজঘট বাঁধাবেই। আজকের সমাজে এই যে হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি, অভাব অভিযোগ যা কিছু বিবাদ, কলহ সবই মনের উপযুক্ত খোরাকের ব্যবস্থা করতে না পারার কারণে মন এদিকে ওদিক করছে। মন তার উপযুক্ত খাদ্য না পেয়ে সামনে যা পাচ্ছে সেইগুলি খেয়ে তাতেই সাড়া দিচ্ছে। আমরা খাদ্য হিসাবে মনকে কি দিচ্ছি? আমরা বলছি যা ঝগড়াঝাটি কর, যা মারামারি কর, খুনোখুনি কর। তখন মন এইগুলি থেকেই খোরাক সংগ্রহ (খোঁজে) করে। তাই দিয়ে মন তার ইচ্ছা মতো যা খুশী করছে, মারছে, ধরছে, লুটপাট করছে, সমস্ত উথাল পাথাল করে সবকিছু ওলোট পালোট করে দিচ্ছে। আর তার থেকে সাময়িক খোরাক নিয়ে নিচ্ছে। যার ফলে ঘরে বাইরে, চারদিকে আরও বিশৃঙ্খলার পরিবেশ গড়ে উঠছে।

সমাজ সংসারকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে মন-কে দিতে হবে তার উপযুক্ত খোরাক। নিজ নিজ মনন শক্তির স্ফুরণের দ্বারা জীবজগত যাতে অনন্ত শক্তির অধিকারী হতে পারে তারই জন্য জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনও ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে অভিনব দর্শন প্রকাশনের **৩৪ তম** শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল **'চিন্তন'**।

পরিশেষে জানাই, পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, যে সকল ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১০ — *চপল মিত্র*

বাং ৯ই পৌষ, ১৪১৭ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

তোমাদের মন বসার জন্য আকুল না হয়ে সহজ পথ বেছে নাও।

সুখচর ধাম
১৭ই আগষ্ট, ১৯৬৭

ঋষি বলছেন, আজ্ঞাচক্রে মন নিবিষ্ট করে অদ্ভুত সুর এবং সাড়া খুঁজে পেলাম। পরে একদিন ফুটে উঠলো আলোর ঝরণাধারা। ঋষি বলছেন, এ অনন্ত শক্তির খেলা। বিভিন্ন রঙ বেরঙের ভিতর দিয়ে কে যেন জানাতে লাগলেন। বেদমন্ত্র...। পরমানন্দ পরম সুর বুঝাবার জন্য শঙ্কর শিবশম্ভু দিলেন এই মন্ত্র, এই মহানাম, রাম নারায়ণ রাম। এই মহানাম শুনলে, এই মহানাম উচ্চারণ করলে জীবের মুক্তি অনিবার্য।

ঋষি আজ্ঞাচক্রে, সহস্রারে বসে দেখতে লাগলেন। সমস্ত মেঘের টুকরো দিয়ে আকাশের বুকে লিখলেন ''রাধা রাধা''। কৃষ্ণ বলছেন, 'ধারায় ধারায় রয়েছে আমার রাধা।' অনন্ত আকাশই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বলছেন, 'রাধা তুমি আমার আলিঙ্গনে থেক, পতন হয়ে যেও না।' মেঘ পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে আছে মহাশূন্যে। কিন্তু তার পতন হয়নি। মেঘের খণ্ডে খণ্ডে লেখা আছে এই সুর। তোমরা ঠিক মেঘের মত থেকো।

আকর্ষণের মধ্যে থেকে, আলিঙ্গনে থেকে জীবকল্যাণে থেকেও মুক্ত, এই হল রাধা। রাধা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে আছেন। সবটার মধ্যেই আদি সুর আছে। আবার খুঁজতে গেলে খুঁজে দেখবে, কিছুর মধ্যে নেই। **মেঘের থেকে গর্জন বর্ষণ। আবার মুক্ত হয়ে বিচরণ করছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমও সেইরকম। জীবের সাথে যোগাযোগ রেখে মহাশূন্যের দোলনায় দুলছেন**

রাধাকৃষ্ণ। মায়া মোহের আকর্ষণে থেকেও, সব কর্ত্তব্য কর্ম করেও, মুক্ত থাকবে।

তোমাদের মন বসার জন্য আকুল না হয়ে সহজ পথ বেছে নাও। ২০/২৫ হাজার বছর আগে বেদজ্ঞরা কি করতেন? আপনিই তাঁদের ভিতরে স্মরণ হতে শুরু করেছে। তারা বুঝতে পারছে না কোথায় যাচ্ছে, তবুও যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে আজ্ঞাচক্র থেকে সহস্রারে উঠে যাচ্ছে। সহস্রারে গিয়ে আবার মূলাধারে গেছে। তাতেই সুর বেসুর হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতিই বেদ। তারা আপনমনে বেদ চর্চা করছে। সুরের ঢেউয়ে ভিতরে ভিতরে উথাল-পাথাল হয়ে যাচ্ছে। জীবনের প্রথম সুর; সুরের স্ফূরণ হচ্ছে। তারা নাম জানে না, ভগবান জানে না। উন্মাদ পাগলের মতো সুর টেনে চলেছে। সুর আরও গভীর সুরে চলে যায়। শুধু কান্না, শুধু উন্মাদনা তাদের সুরের আকর্ষণে টেনে নিয়ে চলেছে। বেদ যখন রূপ নিতে শুরু করলেন, মন্ত্ররূপে ধ্বনিরূপে আবির্ভূত হলেন, 'রাম নারায়ণ রাম' মন্ত্রই, ধ্বনিই একমাত্র সার।

বিষ্ণু বললেন দেবর্ষিকে, আমি আমাকে ডাকি। আমাকে আমি মন্ত্রের দ্বারা স্মরণ করি, মনন করি। আমার বাঁধনে আমি আছি। আমার মন্ত্রে আমি বাঁধা। আমাকে স্মরণ করলে বেদকে স্মরণ করা হয়। নামের মাধ্যমে মন্ত্র। বেদের ধারাতে আমার ধারা। মন্ত্রকে স্মরণ করলেই বেদকে স্মরণ করা হয়। তোমার ও আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পৃথিবী ঘুরছে মহাশূন্যে। সেখানে কোন উঁচুনীচু নেই। অন্তর্নিহিত সুর জাগলে আপনি প্রস্ফুটিত হয়।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

ফোঁটা ফোঁটা জপ ধ্যানে মনন করলে ভিতরের সুপ্ত যন্ত্রগুলি সব জেগে উঠবে

পাম এ্যাভিনিউ
২৪শে অক্টোবর, ১৯৬৫

জন্মোৎসব হল। কালকে আত্মীয়স্বজন অনেকে এসেছিল। ভেবেছিল, এর কেস টেস এত কিছু হ'ল। তাই দেখতে এসেছিল। বাইরে থেকে বহু জায়গা থেকে শিষ্যরাই বেশী এসেছিল। এখন তোমরা বালক সন্তান দল 'কড়াচাবুক' সম্বন্ধে বেশী নজর দেবে। চিত্ত প্রসাদ তুমি এদিকে একটু নজর দিও। 'চাবুকে'ই প্রথম আমার কথা উঠেছিল। ঢাকায় এই কাগজটা বের হতো। অন্য চিন্তা না করে এটার একটা সুরাহা করবো।

অনেক কিছুই জানি। একজন সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টে ছিল। কিছু কথা হল। হ্যাঁ এসেছিল। যে প্ল্যান করেছি, তিনটা দেশ একত্র করার, কানেকশন করার একটা উইশ (wish) আছে। তার সঙ্গে কাজও আছে। তিনটা দেশ একত্র হলে কোন অসুবিধা থাকবে না। ওরা বলে, রাশিয়া বর্বর। তা যাই থাক, আমাদের উপর বর্বর হবে না। সুভাষ বোস কি করেছেন? বিভিন্ন প্ল্যান এ্যান্ড প্রোগ্রাম করে করে রেখেছেন। এই তিনটা দেশে আলাদা সৈন্য টৈন্য থাকবে। এই গভর্ণমেন্ট থাকতে

পারবে না। এটা নাবালোকের গভর্ণমেন্ট। সুভাষ বোসের মধ্যেই একমাত্র গুণ আছে। প্রফুল্ল ঘোষের মধ্যে কিছুটা গুণ আছে। শ্রুড্ (ধূর্ত) নয়, কর্মী ভাল। জনকল্যাণের দিক দিয়ে অনেক কাজ করতে চায়। লোকটি ভাল। কাল দীপ্তেন্দু স্যান্যাল হঠাৎ এসে হাজির। আমাকে জিজ্ঞাসা করলো শরীর কিরকম? কেস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো।

আমি বলি, আমি সুস্থই। তবে নানাদিক দিয়ে একটু ব্যস্ত আছি। এই যে কেস (মামলা) হচ্ছে, তাতে আমার কিছু হবার নয়। যার জন্য এসব হচ্ছে, তাকে আমি ছাড়বো না। আমাকে টাকা দিয়ে, আমাদের টাকার লোভ দেখিয়ে ভুলাতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ কতদিন লাগবে?

উত্তর ঃ পাঁচ বছর লাগতে পারে।

তিনটা দিকের কথা বললাম। তোমরা এই সংগঠনের পত্রিকা দ্বারে দ্বারে বিলি করবে, প্রচার করবে। আমরা লিখবো। মাস্‌কে (Mass) guide (গাইড্) করে আমরা চলে যাব। দীপ্তেন্দু সান্যালকে বলেছি, কিছুটা চাবুক দরকার। স্বাধীনতা রক্ষা করার 'ই'টা (মনোবল) তৈরী নাই। বিল্ডিং বিশ তলা করবে। কিন্তু ভিত্তি নাই। বিল্ডিং অনুযায়ী গাঁথনিটা পাকা করতে হবে। চায়না ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নিলেও আবার ফিরিয়ে দেবে। ইন্ডিয়াকে বিশ্বাস করতে পারছে না। রাশিয়া ও চায়না দু'দিক থেকে চাবুক মেরে ঠিক করে দেবে।

আধ্যাত্মিক দিকেও যে নীতি নিয়ে ফাইট করছি, ভীষণ আক্রমণ আসছে। আধ্যাত্মিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে আধ্যাত্মিক ভিত্তি দিয়েই সুবিধা করে নিতে হবে। নাম,

জপ, ধ্যান ঐ বালক সন্তানদলের মধ্য দিয়েই করতে হবে। বিশ্বকল্যাণ সংস্কৃতি পরিষদ করে তুমি যে অবস্থা করেছিলে, শেষে মার খাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ওটা এখন থাক। বালক সন্তান দলের হয়েই কাজ করো। এদের মত কর্মী ছেলে খুব কম আছে। ওদের হাতে আমি অস্ত্র (জ্ঞান অস্ত্র) ছেড়ে দিতে চাই। পৃথিবীটা যে আছে, একটা সংগঠনের জন্যই আছে। সূর্যটা যে আছে, এই তেজ কণিকায় কণিকায় পরিপূর্ণ হয়েই আছে। আমরাও সমস্ত 'ই' গুলোকে দুর্নীতিগুলোকে দূর করার জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করবো। সেই হিসাবে গ্রন্থের মাধ্যমে, আলোচনার মাধ্যমে একটা আলোড়ন আনবো। অনেকটা এগিয়ে এসেছি। গভর্ণমেন্ট এই সংগঠনের বিষয়ে খুব জেনে ফেলেছে। অতি সহজে যাতে অগ্রসর হওয়া যায়, সেই প্রণালীগুলো তোমাদের কিছু কিছু দিয়ে ছেড়ে দেব। হয় চাবির ছড়া দেব, নয় নম্বর দেব ৭, ৫, ৩, ২; জানা থাকলে সুবিধা হবে। তোমাদের হাতে সেই প্রণালী দেওয়া হবে। সেই প্রণালী হচ্ছে সহজ ধ্যান, স্বরগ্রাম, স্বরলিপি। এমন জিনিস, যে যখন বুঝবে, আপনি কাজ করবে। যেখানেই তুমি থাক, তোমার মধ্যে সুর দেবে। বুকলেট করে পারসোন্যাল তোমাদের পকেটে থাকবে। দাঁত উঠবার আগে যেমন কামড়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু কামড়ায় না। তেমনই এই লিপিতে কামড়াবে না। সমুদ্রের পারে, দূর হতে বাতাসটা ঠাণ্ডা লাগে। তখন বুঝা যায়, সমুদ্র নিকটেই আছে। যেদিন তোমাদের টেনে নেবে, সেদিন বুঝবে। টেনে নেওয়ার যে 'ই', যে তাগিদ অর্থাৎ ভিত্তি, সেটা ভীষণভাবে জাগবে। উঠন্ত বয়সের একটা কাম আছে। সেই কামভাব আসবে। মানে ভিতর থেকে তেষ্টা জাগাবার স্ফূরণ আসবে। কয়েকদিন জপ করলেই আসবে। তখন আবার

অসুবিধাও হবে।

একসুরের মতন ভিতরের দৃষ্টিশক্তি (inner-eye) জেগে উঠবে। অন্ধ যে দেখে না, ক্যামেরা ফিট করলে তার ছবিও উঠে যায়। ঠিক তেমনই ভিতরের ছবিগুলি উঠে যাচ্ছে। তোমাদের মধ্যে উইদাউট ম্যান (without man) ক্যামেরা fit করে রাখলে যেমন ছবি ওঠে, সেরকমই মনের প্লেটে ছবিগুলো উঠতে থাকে। অন্ধ তেমনই দৈহিক বৃত্তির, মনের বৃত্তির সঞ্চালনে প্রকৃতি হতে জিনিস টেনে নিয়ে ছবি তুলে ফেলে। তারপর ডার্করুমে এ্যাসিডে ওয়াশড্ (washed) হয়ে ছবি বেরিয়ে আসে। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি সে ছবি দেখতে পায় না। **আমাদের চিন্তার জগতে মননের গভীরে যে ছবিগুলি উঠতে থাকে, 'ইনার আই'-য়ের (অন্তর্চক্ষুর) ভিতরে দেখা ক্রিয়ার সহযোগিতার জন্য যে জিনিসগুলি আছে, মনের প্লেটে ওঠা ছবিগুলি দেখতে তোমার মধ্যে সেই জিনিসগুলি এসে তখনও পৌঁছায়নি। শিরাগুলি এখানে দিলে দেখবে, চক্ষুক্রিয়ায় এখন দর্শনের জিনিসই বেশী। এই দর্শনের জিনিস এমন ধারালো যে, আশ্চর্য হয়ে যাবে।** কত জিনিস দেখে ফেলবে। কত জিনিস এসে পড়বে। তখন ভারী মজা লাগবে। 'চাবুকে'র (পত্রিকার) মাধ্যমে কিভাবে সহজে পাওয়া যায়, তাই বলা হবে।

অনন্ত জগতে যেসব গ্রহ উপগ্রহ আছে, সব তোমার সুবিধার জন্য বর্তমান। যে সমস্ত বিষয় বস্তু নিয়ে এসব হয়েছে, তা তোমার মধ্যে আছে। তারই সাহায্যে তুমি বহুদূর অগ্রসর হতে পার। ফোঁটা ফোঁটা জপ ধ্যানে ভিতরের সুপ্ত যন্ত্রগুলি সব জেগে উঠবে। যে জিনিস আছে তোমার মধ্যে,

তাই দিয়েই সব বুঝতে পারবে। হাত দিয়েই সেটার নাগাল পাওয়া যাবে। তিন মাইল দৌড়িয়ে যাওয়ায় তো লাভ নাই। তাহলে ইউনিভার্স ঘোরা হবে না। মনের গতির সাথে সাথে তোমার দেহের গতি হবে। **মনে কর, তুমি বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহে যাবে। ধর, প্রণালী (ধ্যান, জপের পদ্ধতি)তুমি চিন্তা করলে। যন্ত্রটা (দেহ) তো এখানে টরেটক্কা (জপ) করছে। ওই বৃহস্পতি ও মঙ্গলগ্রহে তোমার স্বরূপটা চলে গেল। দেহ এখানে থাকলেও প্রাণের সত্তাটা ওখানে গিয়ে দেখবে।** তাহলে কি দেখার শেষ হল?

নির্মাল্যকে বলেছিলাম, এক চক্ষু যদি সহস্র ব্যক্তিকে দেখতে পারে, তাহলে একচক্ষুতেই সহস্রব্যক্তির দর্শনের কাজটা হয়ে যাবে। তোমাকে যদি বলে, 'কেন দেখলে সহস্র ব্যক্তি'? তুমি বলবে, হাজার লোক চোখের (দৃষ্টির) মধ্যে পড়ে গেলে কি হবে? তখন না দেখে উপায় কি? এক ব্যক্তি লক্ষ ব্যক্তি হতে পারে ১ সেকেণ্ডে। আয়না এরকম ওরকম করে যদি নানাভাবে ফিট (fit) কর, তবে দেখবে তুমি এক ব্যক্তি লক্ষ ব্যক্তি হয়ে গেছ। তোমার আকৃতিতে লাইন পড়ে গেছে। তুমি মনে কর, এই পৃথিবীতে ভারতবর্ষে আছ। আর একজন মঙ্গলগ্রহে আছে। চিন্তার সাথে সাথে সমস্ত জায়গায়, একই টাইমে একই ভাবে দেখা হয়ে যাচ্ছে। কিরূপে? কিভাবে? তোমার এক ইঞ্চি চক্ষুকে যদি দশ ইঞ্চি কর, যদি বিশ কোটি গুণ বৃদ্ধি কর, যদি আরও বিস্তৃত কর, তাহলে যতদূর পর্যন্ত অনুপরমাণু রয়েছে, প্রত্যেককে দেখতে পারছো। তার মানে তুমিই সবাইকে দেখছো। মনে কর, শরীর এক, মাথা দুই। একদেহে দুইজন বসে কথা বলছে। রাবণের শরীর এক, দশ

মাথা। এরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে। তোমরাও এক একটি শরীর নিয়ে, মনের বিস্তৃতির সাথে সাথে সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পার। তখন সকলের মাথা তোমাদের মাথা হবে, সকলের চক্ষু এক চক্ষু হবে। তখন কত বড় প্রাণী হয়ে গেলে। তাতে যাওয়ার দরকার নেই। মনের গতির সাথে দেহও গতিময় হয়ে যাবে।

আমাদের উদ্দেশ্য হল, সেই প্রণালী শিক্ষা করা, যাতে শেষবেলায় যেন আমরা একজায়গায় যেতে পারি। সেখানে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। সেখানে 'নাই'-এর মধ্যে, সুরের মধ্যে সুর দিলাম। আবার 'আছি'-র মধ্যেও সুর দিলাম। আমরা সেইভাবেই কাজ করবো। এই জাগরণের সুর জনগণের মধ্যে, সকলের মধ্যে ছড়াতে চাই। আমরা হতাশা নিরাশার মধ্যে যাবই না। আসুক ঝড়, আসুক ঝঞ্ঝা। হয়তো টাকা পয়সার অভাব হবে। অভাবের সুবিধার জন্য ব্যবসা করার ইচ্ছা আছে। যাক এখন, তাহলে সেইভাবেই তৈরী হও। সময়মত টুকে টুকে (লিখে লিখে) প্রণালীর একটা বুকলেট কর। প্রত্যেকটার মধ্যে why (হোয়াই) 'কেন' দিতে হবে। কেন হয়? **প্রত্যেকটার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়ে সব প্রণালী বুঝিয়ে দিতে হবে। মৃত্যুও যেন শেষপর্যন্ত ইচ্ছাধীন হয়ে যায়। আমার না হউক, তোমদের ইচ্ছাধীন যেন হয়। কারণ আমি এখন আইনে আটকা। এখানে সাধনা করে বড় হলে না হয় হতো। বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি বলেই, নেবে এসেছি বলেই মৃত্যুর ইচ্ছা করলে প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ হয়ে যাবে। তবে সুবিধা হলো, যতখুশী বাঁধতে পারবো, নিয়ে যেতে পারবো।**

পাপ-পুণ্যের জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। এই

ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থেকো। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বাস্তবক্ষেত্রে ভাগ্যফলে আটকাবে না। নিশ্চিন্ত মনে যা খুশী করতে পারবে। শুধু ঐ প্রণালীর মতন কাজ করে যাবে। শীঘ্রই কাজ শুরু করে দেব। আমাদের তরী, নামের তরী। ওটাতে আমরা সব উঠেছি। জন্ম যদি আর না হয় এখানে, তবে অসুবিধার আর কি আছে। পুণ্যও চাই না, পাপও চাই না। তবে তো ঝুলছই শূন্যে। খুব জোরকদমে কাজ করো। টাকাও ঘুরছে তোমাদের পিছনে। স্বাধীন স্ফূরণের সুর ঘুরছে। **নবজাগরণ যাকে বলে, আমি তা দিয়ে যাবো। কোন ধর্ম আর টিকবে না। তবে সত্য সবসময় টিকবে। যেগুলির মধ্যে শয়তানি ঢুকে গেছে, সেগুলি আর টিকবে না। যে গুরুভার নিয়েছ, গুরু দায়িত্ব নিয়েছ, তা পালন কর।** কিছু কিছু অনুষ্ঠানের দরকার। ফেলিওর (ব্যর্থতা) আসবে। ডিসহার্টেন্‌ড্ হবে। তোমরা শুধু কাজ করে যাও। ফুৎ করে সব নিয়ে যাব, ফুৎ করে। মনে রেখো। কাজ করে যাও।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

মনই মাত্রার পারদ

শ্যামবাজার, ৪৬, ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ
১০ই নভেম্বর, ১৯৫৭

নিবিষ্টতায় মন স্থির করবার জন্য বহুদিন বহু ক্লাস করেছি। কিন্তু সবকিছু অভ্যাসের দ্বারাই সম্ভব হয়। সর্বদা চেষ্টা করবে, যাতে মনকে স্থির করতে পার। স্থির হোক বা না হোক, তার জন্য ভাবতে যেও না। ভাবনা শুধু থাকবে, যে কাজ দেওয়া হয়েছে, যে মন্ত্র দেওয়া হয়েছে, যে নিয়মগুলো বলে দেওয়া হয়েছে, সে সবের মধ্যে আছ কি না। ঐগুলির মধ্যে থাকলেই যথেষ্ট।

মনের স্বাভাবিক ধর্ম— বিক্ষিপ্ততা। বিক্ষিপ্ততার মধ্য দিয়ে মন সবসময় আসা-যাওয়া করে। কিন্তু তাই বলে মনকে বিক্ষিপ্ত বলা সমীচীন নয়। **মন যখন বিক্ষিপ্ততার পথ দিয়ে যেতে থাকে, তখন বলা হয়, মন বড় বিক্ষিপ্ত। আবার যখন স্থিরতার পথ দিয়ে যেতে থাকে, তখন মনকে বলা হয়, মন স্থির। মন যখন ধ্যানে রত থাকে বা অনুভূতিতে ব্যস্ত থাকে, বা অনুভূতি বা সিদ্ধি বা নির্বাণে যখন সে গিয়ে উপস্থিত হয়, তখন বলা হয় নির্বাণ বা সিদ্ধ অবস্থা।** যখন যে ধারা দিয়ে মন চলে যেতে থাকে, তখনই তাকে সেই ধারা অনুযায়ী, সেই ধারণা অনুযায়ী, সেই ধারায় পরিণত করা হয়। জল যেমন যে কোন পাত্রে রাখা হয়, সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, সেই পাত্রের রং হয়ে যায়, মনও ঠিক যে অনুযায়ী যে ধারাতে যায়, সেই ধারা অনুযায়ী নাম ধারণ করে। সুতরাং জল ও মন, দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে।

জলের রূপ কি প্রকার? খুঁজে দেখতে গেলে, এর রূপ দেখেও দেখা যায় না। তার চেয়ে সূক্ষ্ম বাতাস। স্পর্শে অনুভব

ক'রে ও অনুভূতিতে আসা সত্ত্বেও তাকে বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হয়ে উঠছে না। তাহলে বাতাসের গতি যেমন, মনেরও ঠিক তাই। কিভাবে এটা চলে যায়, এত দ্রুতগতিতে যায় যে, সেটা দেখা যায় না। কিন্তু ফলে পরিচয় হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জল, বাতাস, মন প্রতিটির সাথে প্রতিটির একটা সম্বন্ধ আছে; এবং যেখান থেকে মনের উদ্ভব হয়, সেখানে এগুলির একটা সংশ্লিষ্টতা আছে।

মস্তিষ্কের ভিতর সহস্রারে একটা কারখানার মতন আছে। সেই কারখানা থেকে এই মনের সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই কারখানাটুকুনু হতেই মনের উদ্ভব হয়। কাজেই খুবই সূক্ষ্ম সেটা। কারণ উহাই (সহস্রার) তো সূক্ষ্ম। যারা আছে, তারাই সূক্ষ্ম। তার থেকে যখন আবার আর একটি জিনিস বের হচ্ছে, তাহা (মন) আরও সূক্ষ্ম হওয়াই স্বাভাবিক। এই সূক্ষ্মতাকে মানে এই সূক্ষ্মকেই মন নিজে নিজগুণে সূক্ষ্মতার নাম নিয়ে, সে নিজের সূক্ষ্মতাকেই বহিষ্কৃত করবার জন্য সবসময় ব্যস্ত থাকে। মন তার মননশীলতা নিয়ে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে, এই বিশ্বপ্রকৃতির সূক্ষ্ম জিনিসকে বহিষ্কৃত করবার জন্য।

তাই **মন সর্বদা কি করছে? অহর্নিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেটা দৃষ্টির অগোচরে আছে, সেই অগোচর গুলোকে গোচরে আনবার জন্যই মনের এই ব্যস্ততা। এটাই হলো তার কাজ।** তাই মাঝে মাঝে সে (মন) বহু পথ ধরে, বহুভাবে বিভিন্নতার ধারা দিয়ে, নিজে নিজে আপনমনে বেড়াতে থাকে। তাহলে সে সেই পথের পথিক হলেও, সেখানকার সেই স্থায়িত্ব তার নেই; সেখানকার স্থিতির ভিতর সে নেই। শুধু আসা-যাওয়ার মাঝে সে সর্ব সময় থেকে যাচ্ছে। তাই যোগীদের বা সাধারণ জীবের যখন ধ্যান

করবার বা চিন্তা করার ইচ্ছা জাগে, তখন এই মনকে সেখানে নিয়ে ফেলে দেয়। সাধারণতঃ সংসারের যা কিছু ক্রিয়াকলাপ, মন সেই বহু ক্রিয়ার ভিতর রয়ে গেছে ও কাজ করছে। তাই সংসারে কমবেশী সকলেই সাংসারিক জগতে কিছু না কিছু সুফল বা সাফল্য লাভ করছে। আবার বিফলতার মধ্যে পড়েও অনেকে হাবুডুবু খাচ্ছে। মন সেদিক দিয়েও আছে। তবে এই সমস্ত সাংসারিক জীবনযাত্রার ভিতর মন যখন সর্বদা ব্যস্ততায় থাকে, সেটা কিন্তু ব্যস্ততায় নয়। ব্যস্ততার ধারাতে মন যেয়ে শুধু ব্যস্ততা প্রকাশ করছে।

মন নিজে ব্যস্ত হলেও ব্যস্ততা তার নয়। সে নিজে কি করছে? সে নিজ ক্ষমতায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোথায় কি আছে, না আছে। সে নিজ ক্ষমতায় থাকলেও, আবার নিজের ক্ষমতায় দাসত্ব খাতায় নাম লিখিয়ে বসে আছে। যে যখন ওকে (মনকে) ডাকে, তখন তার কাজটুকু করে দিচ্ছে। সুতরাং **মন সবসময়ে ইন্দ্রিয়ের বশেই থাকে। তবুও সে খুশীতে আছে। সে বলে, "আমি বশে থাকি, আর যেভাবেই থাকি, আমি খুশীতেই আছি। আমাকে ডাকলে আমি ঠিকই আছি।"** যারা যারা ধ্যান-ধারণা, জপতপ করছেন, মন বলছে, ''আমি সেখানেও আছি।'' আবার যখন ভগবৎ সত্তায় বা ব্রহ্মসত্তায় উপনীত হয়ে, সে (সাধক) সেখানকার বিষয়বস্তু দেখতে চেষ্টা করে বা দেখতে থাকে, মন বলছে ''আমি সেখানেও আছি।''

মন বলছে, ''আমি দাসত্ব খাতায় আছি। আবার ব্রহ্মখাতায়ও আছি। আবার ব্রহ্মের ভিতর যে মন, সেই মনেও আমি আছি। আবার স্বয়ং মনই আমি সদা ব্যাপ্ত হয়ে আছি।'' কাজেই দেখা গেল, মন হলো একটা। সেই এক মনই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধারাতে উপবিষ্ট হয়ে, বিভিন্ন নামে নামাকরণ হয়েছে মাত্র।

একটি নামেই মন অভিহিত হতে পারে। কিন্তু মন বলছে, ''তা হতে পারে না। তাহলে আমার যে এত ক্ষমতা আছে, সেটা প্রকাশ পায় না।'' তার নিজ ক্ষমতাকে প্রকাশ করবার জন্য, মানে শুধু আত্মপ্রশংসা করবার জন্য নয়, প্রকারান্তরে নিজের স্বরূপকে স্বরূপত্বে আনার জন্যই মন সবসময় একটা ব্যস্ততার প্রকাশ করছে।

এই ব্যস্ততার প্রকাশটা মনের চিত্ত চাঞ্চল্যতার অবস্থা নয়। এটা হলো, প্রকৃতির ধারাবাহিক ধারা অনুযায়ী সে (মন) শুধু বয়ে যাচ্ছে। এই বয়ে যাওয়াটা হচ্ছে মনের চিরন্তন গতি। মন বলছে, ''আমার স্বরূপের স্বরূপত্বটা যে কত বড়, সে সম্বন্ধে আমি নিজেও জ্ঞাত নই। সুতরাং ওটাকে আমার জ্ঞাত করতে হলে, আমার ওটাকে রূপে রূপে রূপান্তরিত করতে হবে এবং প্রতিরূপের অণুপরমাণুর যাবতীয় সূক্ষ্ম বিন্দুর ভিতর, আমি আমার মনকে নিয়ে সবসময় প্রবিষ্ট হই।'' এইভাবে প্রতিরূপের অণুপরমাণুর নিজস্ব সত্তাকে সত্ত্বে পরিণত করার জন্য, প্রতিটি বস্তুর ভিতর যে সত্ত্ব আছে, সত্তা আছে, তার ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে মন নিজেই নিজগুণে নিজ বোধেই, নিজরূপকে বহু বস্তুর ভিতরে প্রকাশ করে। এইভাবেই সে তার রূপকে দেখাবার জন্য ব্যস্ত থাকে। এই ব্যস্ততা তার নিজের স্বরূপত্বকে প্রকাশ করা মাত্র, বা তার নিজের স্বরূপত্বকে নিজে জ্ঞাত হওয়ার জন্য সাড়া মাত্র।

আবহমানকাল হতে যুগ যুগ ধরে যাঁরা তপস্যা করে আসছেন, বা যাঁরা তপস্যার চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যে কেহ একজন হয়তো বসলো সাধনায় বা ধ্যানে; সে সবসময় মনকে তার দুই ভ্রূ-র মাঝখানে, আজ্ঞাচক্রে নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করলো। চেষ্টা করাতে মন দেখলো, ''বাঃ রে, আমায় এখানে কেন

ডাকলো?'' সে আবার আস্তে এখানে এসে বসলো। বসামাত্র এখানকার (আজ্ঞাচক্রের) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিসগুলো তার জ্ঞাতে আসতে লাগলো।

জীবদেহের প্রতিটি চক্রের এক একটা বর্ণনা আছে। সেখানকার আবার definition বা সংজ্ঞা আছে। সেই সংজ্ঞাগুলো সে নিজেও জানে না। ইক্ষুবীজ নিজেও জানে না যে, তার ভিতর মিষ্টত্ব আছে। কিন্তু যখন এটা রোপণ করা হল, এটা তখন আস্তে আস্তে করে বাড়তে বাড়তে কেমন ইক্ষুগাছ হয়ে গেল। আর ইক্ষুর রস কেমন চমৎকার, সে তো জানই। প্রথমে ইক্ষুর বীজের ভিতরে যদি খুঁজতে যাও, খুঁজে দেখবে যে, মিষ্টতা, তিক্ততা কিছুই নেই। সুতরাং আজ্ঞাচক্র সম্বন্ধে মানুষ তো আগেই জেনে ফেলেনি। মন গেল জানতে। মনের কাজই হচ্ছে প্রকাশ করা। সেখান থেকে জেনে নিয়ে, সেখানকার বিষয়বস্তুকে এনে, ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে জানিয়ে দিল যে, ''এই এই আছে। এখন যা করবার করে নাও। আমি চললাম।''

তাই দ্বিদলে (আজ্ঞাচক্রে) যখন একজন ধ্যান করতে বসলো বা ধ্যান করতে আরম্ভ করলো, তা ধিন্-ধিন্-না, তা-ধিন্-ধিন্ না করে, বসে বসে জপ করছে; হঠাৎ দেখা গেল, অন্ধকার। মন বলছে, ''এখানে কি আছে, দেখি।'' সে ঘুরছে সব জায়গায়। ওর তো সব জায়গায় গতি। ওর গতিতো সর্বত্র একেবারে। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে, তখন হয় কি, বেশ একটা তন্ময়তা আসতে থাকে। তখন বিষয়বস্তুগুলোকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এনে ফেলে দেয়। ইন্দ্রিয়— তার আবার নিজস্ব সত্তা আছে; প্রতিটি ইন্দ্রিয়েরই তাই। মন যদিও সেখানেও আছে, তখন সে বেশ উপভোগ করে বসে বসে। মন বলে, '' বেটা, আমি তো যাচ্ছি। তোরা উপভোগ কর।'' এই বলে বিষয়বস্তুগুলোকে চক্ষু,

কর্ণ, নাসিকার কাছে ফেলে দেয়। মন বলে যে, '' তোরা এবার ভোগ কর। আমি আবার খনির মধ্যে চললাম।'' খনির মধ্যে ঢুকে মন করে কি, এই যত সমস্ত তথ্য আছে, মনে কর, আজ্ঞাচক্রে কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস আছে, সব মাথায় করে নিয়ে এসে বললো, ''চক্ষু, তুই নে। কর্ণ, তুই নে। জিহ্বা, তুই নে।'' মাথার মধ্যে সব দিয়ে বললো, ''আমি যাই, তোরা বাটাবাটি (ভাগাভাগি) কর। আমি আর থাকতে পারি না।'' এই বলে, সে চললো।

এই যে একটা অবস্থা; এই যে সবসময় একটা অবস্থা— সাধক তখন আজ্ঞাচক্রে মন নিবিষ্ট করলো। মন কি করছে? ঐ বাইরের জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছে। আবার ঐ ভিতরকার জিনিস মনের সাহায্যে বাহ্য ইন্দ্রিয়ে যখন আনা হচ্ছে, সে (সাধক) তখন সেগুলো অনুভব করলো, বুঝতে পারলো, ''এখন অনুভব করলাম যে, আজ্ঞাচক্রে এই এই জিনিসগুলো আছে।'' আর যখন আছে, তখন এগুলো শাস্ত্রাকারে গ্রন্থাকারে লিখতে আরম্ভ করলো। এই আজ্ঞাচক্রে নিবিষ্ট হয়ে সাধক তখন বললো, ''আবার মনটাকে পাঠাই।'' বুদ্ধিবৃত্তি করলো কি— মনকে বললো, ''আমি বড় আরাম পেয়েছি। হে মন, আমি বড় আরাম পেয়েছি, বড় তৃপ্তি পেয়েছি, আনন্দ পেয়েছি এবং উপভোগ করছি। তুই আবার ওখানে যেয়ে বসে থাক।'' মন বলে, ''বাঃ রে, বাপরে বাপ্।''

আবার মনকে সেখানে পাঠিয়ে দিল। সেখানে মন গিয়ে বসলো। মনকে বললো, '' দেখ, তুই এখানে থাক। তোকে তালা টালা দিয়ে আটকিয়ে রাখি। Gate (দরজা) আটকিয়ে দেব। তুই এটার (আজ্ঞাচক্রের) ভিতর থাকবি।'' ওখানে মনকে পুরে (নিবিষ্ট করে) তালা দিয়ে আটকিয়ে রেখে দিল। সাধক দুই ভ্রূ-র মাঝখানে দ্বিদলে মনকে স্থির করলো। মন বলছে, ''এখন কিসের মধ্যে গেছি।'' মনটা সেখানে

সাধারণতঃ কিরকম? মনটা সেখানে জলের মতন।

আজ এই যে জল দেখছো, খুব বেশী শীত পড়লে এটা বরফ হয়ে যাবে। তখন এটার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যাবে। অনেক জায়গা আছে, **সমুদ্রে অনেক জায়গা আছে, যেখানে জলটা বরফ হয়ে যায়। তার উপর খেলাধুলা করা যায়। তখন আজ্ঞাচক্রে মনটা করে কি, সেখানে জমে যায়। ওখানে থাকলে, মনটা জমে একেবারে বরফের মতো হয়ে যায়, solid হয়ে যায়। এখন জমে গেলে কি ফ্যাসাদ। তখন মনটা করে কি, জমে সেখানে ঠিক আজ্ঞাচক্রের ছাঁচে ছাঁচ হয়ে যায়, বিরাটের সুরে মন নিবিষ্ট হয়ে যায়। ছাঁচ আছে না? ক্ষীরের ছাঁচ, সন্দেশের ছাঁচ; অনেক রকমের ছাঁচ আছে। আজ্ঞাচক্রেরও ছাঁচ আছে। এই ছাঁচে মনটা যখন যায়, ছাঁচে পড়ে বেশ একটা কিছু হয়ে গেল। এখন ব্যাপারটা হলো কি, সাধকের সাধনায় মনটা বেশ আটক হয়ে গেল তো; আটকা পড়ে জমে গেল।** তখন সাধক বললো, ''আচ্ছা, আনলাম তো মনটাকে, এখন তো জমালাম। এখন কি করি?''

কোথায় ছিল চিনি? তাকে ঘন করে শিরা (রস) করলাম। তারপর করলাম গাঠ্ঠা, তারপর কদমা। তখন সাজও (ছাঁচও) বললো, ''আচ্ছা, আনলাম তো। এখন তো জমালাম। তারপর করলাম কদমা।'' ঐ যে দেখেছো না, তারপর করে কি, ঘন শিরাটাকে (চিনির রসটাকে) পাত্রের মধ্যে ঢেলে দিয়ে টুকিয়ে টুকিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে, ওটাকে টেনে যার যার ছাঁচ বা সাজ মতন সাপ বানায়, ব্যাঙ বানায়, যখন যা ইচ্ছা বানায়। আমাদের দেশে (বাংলাদেশে) আছে না, এইগুলো সব তৈরী করে।

তখন সাধক আজ্ঞাচক্রে মন স্থির করে, করে কি? এটাকে (মনটাকে) তো ঢালাই করে সাজালো। মনটা তখন নরম নরম

থাকে। নরম তো থাকে; তখন টেনে নিয়ে করে কি? বুদ্ধি হলো তার 'ই' কড়াই। ওই বুদ্ধির কড়াইয়ে এটাকে ফেলায়। বুদ্ধির কড়াইয়ে ফেলে দিয়ে মনটাকে কি করে ফেলেছে। শেষে সাধক করে কি, যতগুলি ইন্দ্রিয়ের দরজা আছে, সিমেন্ট দেবার মতো সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলো বন্ধ করে দেয়। তখন জায়গায় জায়গায় সিমেন্টের মত কাজ হয়ে যায়। মন তো আটক হয়ে গেল। মন আটক হয়ে গেলে, সেই মনকে নিয়ে সাধক তখন যা খুশী তাই করতে পারে। সাধক যদি বলে, 'আমি এখন এই কাজ করবো,' 'সেই কাজ করবো,' মন সাথে সাথে সেটা করে দেয়। তাই 'ও' (সাধক) যখন যা বলে, সেই কাজই করতে পারে। তখন সেটা বিভূতি হয়ে গেল।

বিভূতি হলেই তো হয়ে গেল না। একটা অবস্থা হলো মাত্র। শুধু একটা অবস্থা হলো। তখন সাধক আবার বলছে, ''কি করা যায়? আমি তো দর্শন চাই, সিদ্ধি চাই, মুক্তি চাই।'' মনকে আবার সেখানেও যেতে হবে। তখন ঐ মনটাকে নিয়ে করে কি, আজ্ঞাচক্রের ভিতর এনে সহস্রারে নিয়ে ফেলে দিল। সহস্রারে এসে আবার সেই সাজে (ছাঁচে) গলে, সেই সাজে পরিণত হয়। এটা (সহস্রার) এরকম জিনিস (পদার্থ) যে, এর মধ্যে যেগুলি পড়ে, সেগুলি আটকিয়ে থাকে। সহস্রারের মধ্যে গিয়ে মনটা করে কি?

আগেকার দিনে করতো কি জানো? এই কোনারকের মন্দির আছে, পুরীর কাছে— বিরাট বড় একটা চুম্বক মন্দিরের চূড়ার উপর রেখে দিয়েছে। শত্রুপক্ষের ষ্টীমার যেতো; ওই চুম্বক টেনে নিয়ে আসতো। তারপর ওখান থেকে, ওই স্টীমার থেকে মালপত্র লুটপাট করে নিত। কিছুতেই ধরতে পারতো না। ষ্টীমার যদি দশ বিশ মাইল দূর দিয়েও যেতো, ঐটার (চুম্বকের) এমনি

টান যে, ষ্টীমারের মেজাজ খারাপ হয়ে, সামনের দিকে টেনে না নিয়ে, পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যেত। সামনে এটার গতি। পিছনের দিকে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তা বললে কি হবে? পিছনের দিকে টানতে টানতে ষ্টীমারটাকে একেবারে একটা মন্দিরের কাছে নিয়ে এল। তখন ওখানে সব দস্যুরা থাকে। তারা আচ্ছা মার মেরে, ষ্টীমারে যা ছিল, সব নিয়ে ভেগে গেল। এইরকমই চলতো।

এইরকম একটা চুম্বকের মতন সহস্রার তো। আ আ আ করে, বীজমন্ত্র জপ করে করে, সহস্রারকে একখানা চুম্বক করে দিল। এই দেহরূপ মন্দিরটার মধ্যে বিরাট একটা চুম্বক হয়ে গেল। এই চুম্বকটা করে কি? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যতগুলি ক্ষমতা আছে, যা কিছু আইন-পদ্ধতি চলছে, এটার মধ্যে টেনে নিয়ে আটক করে দিল। মেশিনটার মতন, যেমন যে যা কথা বলে, এটার মধ্যে আটক হয়ে যায়। একটা ফিতা (টেপ), ফিতাটার কি গুণ, কথা বললে, একটা ফিতার মধ্যে কথা আটক হয়ে যায়। কি সাংঘাতিক কথা। ফিতা যদি কথা আটক রাখতে পারে, মনের ফিতা কি না করতে পারে?

মনের ফিতা বিরাট। মনের ফিতা যায় কোথায়? কোথায় আর? বিশ্ব জগতের যাবতীয় যা কিছু আছে, যা চলছে, সব কিছু এটা আস্তে আস্তে করে টানতে থাকে। এখন টানতে টানতে হয় কি, ফিতার মধ্যে তখন ওখানকার কথা, ওখানকার সব ধাঁচ, জ্ঞান বুদ্ধি সব ওখানকার মতো হয়ে যায়। যেমন ফিতায় (টেপে) কথা ভিতরে থাকে, আর ওটায় (মনের ফিতায়) হয়ে যায় কি, ওটা এমনি জিনিস যে, রং চেহারা সব বদলে যায়।

অনেক পাহাড়ে এমন সব জীব আছে, যারা ইচ্ছা করলে

মুহূর্তে অন্যের রূপ ধারণ করতে পারে। মনে কর, একটা জীব আরেকটা জীবকে ধরে পিছনে কামড় দিতে গেছে, ঠ্যাং আটকিয়ে যাচ্ছে, তখন ঠিক আক্রমণকারী জীবটার মতন চেহারা হয়ে গেছে। তখন সে দেখে, 'আমারই জ্যাঠতুতো ভাই-এর ঠ্যাং-এ কামড় দিয়েছি। দূর যা। ছেড়ে দাও।' জ্যাঠতুতো ভাইকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আর সেই জীবটা ভাবলো, 'বাঁচলাম।' 'ও' তখন নিজের চেহারা নিয়ে চলে গেল। এইরকমভাবে একটা জীব কামড় দিলে, তার চেহারা ধারণ করে ফেলে। এই ক্ষমতা অনেক জীবের আছে।

এখন মনটা বিশ্বের ক্ষমতাটা এনে করে কি? ওই সমস্ত ক্ষমতাটাই মনের হয়ে যায়। ক্ষমতাগুলো টেনে টেনে, মন সেই সেই রূপটা ধরে ফেলে। ওখানে যে রূপটা আছে, সেই রূপটা নিয়ে, ওখানকার মতো হয়ে যায়। তখন মনের ওই রূপটা হয়ে গেলে, তারপর তো স্রষ্টার মতন হলো। তখন সেই রূপটা, বিশ্বের রূপটা নিয়ে ওটার (সহস্রারের) মধ্যে ছেড়ে দিল। সহস্রারের মধ্যে বিশ্বজগতের সমস্ত ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হলো। এখন এই মনটা টানতে গেলেই ক্ষমতাগুলো আপনি এসে যায়, এটা (সহস্রার) এমনই জিনিস।

মেশিনের মধ্যে তেলটা দিলে, মেশিনের সমস্ত যন্ত্রপাতিগুলোর ভিতর দিয়ে গিয়ে, মেশিনটাকে কেমন সহজ করে দেয়। সিঙ্গার মেশিনের মতন, মেশিনটা যাতে সুস্থ থাকে, ভাল থাকে, তার জন্যই তেল দেয়, আর কি। সমস্ত যন্ত্রপাতি যেখানে যেটা আছে, যেখান হতে তেলটেল নেবার দরকার, সেখানে তেল দিয়েই মেশিনটা smoothing condition-এ (ভালভাবে চালু) রাখে। আর এখানে এই দেহরূপ মন্দিরে, সহস্রারে যন্ত্রপাতি তো

কয়েক লাখ। বাপ্ রে বাপ। এইসব যন্ত্রপাতির ভিতর দিয়ে গিয়ে মনটা করে কি? গলে যায়। আস্তে আস্তে, আস্তে আস্তে গলে গলে সমস্ত যন্ত্রপাতি একেবারে ভরে যায়, ভরাট হয়ে যায়।

ভরে (ভরাট হয়ে) গিয়ে কি হয়? এমনই আশ্চর্য, সমস্ত যন্ত্রপাতি যেগুলি আছে, সেইগুলো আবার ঠিক ওর (মনের) ধাঁচের মত হয়ে যায়। ওর ধাঁচে হয়ে যাওয়াতে হয় কি? তুমি কিছুই জানতে না। তুমি কিছুই জানতে না ঘুমোবার আগে। ঘুম হতে উঠে বিরাট এক গায়ক হয়ে গেলে। ঘুম হতে উঠে, একজন বড় ওস্তাদ হয়ে গেল। ঘুম হতে উঠে, দেখা গেল, বড় পণ্ডিত হয়ে গেল। ওই হয়ে গেল, একদিনের মধ্যে কতকিছু। যখন যেটা তুমি চিন্তা করতে যাচ্ছ, তখন তা (সেই অবস্থা) হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই বিরাটের ভিতর যতগুলি ক্ষমতা আছে, সব তোমার আয়ত্তে এসে যাচ্ছে। যেথায় খুশী সেথায় তুমি অনায়াসে খুব সহজভাবে যেতে পারছো। সবকিছু বুঝতে পারছো এবং সবসময় সেই সত্তার সঙ্গে তোমার সত্তা মিশে, বিরাটের অনুভূতিতে তুমি ভরপুর হয়ে রয়েছ। এই যে অবস্থাটা, এই অবস্থার যে ক্ষমতাগুলো, সবসময় সমস্ত জীবের ভিতরেই বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা কি অবস্থায় আছে?

সেটা এখানকার পাত্রেই, সাংসারিক জীবনযাত্রার মধ্যে, এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে যাতায়াত করে। প্রত্যেকেই কি আর ভদ্রভাবে থাকতে পারে? এলোমেলো হয়ে যায় না? হয়তো একজন ধুয়া খাচ্ছে। আরেক জনের সার্টে বা পাঞ্জাবীর মধ্যে আগুনের ফুলকি লাগলো। সে বলে উঠলো, ''ও মশায়।'' এইরকম এক একটা অবস্থা আর কি। এখন সংসারে এই যে এলোমেলোভাব, কারও কোনরকম কোন ঠিক নেই।

একেবারে যা তা অবস্থা। এই সংসারটা এমনই হয়ে গেছে। মনের কাছে এমন একরকম অবস্থা যে, এর থেকে, সংসারের এই যা তা অবস্থা থেকে আর উঠতে পারছে না। তবুও মন বলছে, ''এই যে সৃষ্টি হচ্ছে, মন থেকেই তো হচ্ছে।''

তোমরা আমরা যে সৃষ্টি হয়েছি, বাবা মা যে সৃষ্টি করলেন, তা মনের থেকেই সৃষ্টি। সুতরাং মনের থেকেই কাম। কামের পথ দিয়ে মন গেল। সেই কামের উত্তেজনা নিবৃত্তি করলো। দেখতো, কেমন সৃষ্টি হয়ে বের হয়ে আসলো। একদিন আমরা বের হয়ে আসলাম। কাম কি রকম সুন্দর। মনটা সেখানে নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে। এই কাম ইন্দ্রিয়ে মন নিবিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে দেহে উত্তেজনা হলো। উত্তেজনার নিবৃত্তি হলো। নিবৃত্তি হয়ে দেখ, এই জগৎ সৃষ্টি হয়ে গেল। এতটুকু মন কি করে ফেললো।

প্রকৃতি বলছে যে, ''এই এতটুকুতেই যথেষ্ট। এরচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় না।'' **মন বলছে যে, তুমি আমাকে যেথায় যেভাবে খাটাবে, আমি সেভাবে খেটে তোমায় সুফল দান করবো। কিন্তু আমাকে আমার খোরাকটা ঠিক মতন দিও। আমাকে সারাদিন কুলির মতো খাটাও, ক্ষতি নেই। আমি খাটতে রাজী আছি। কারণ আমি মাঝি, মল্লা, কামলা। কিন্তু আমার যে খোরাকটা, খাদ্যটা, তা ঠিকমতন দেবে তো?** খাটিয়ে খুটিয়ে দু'খানা বেত মেরে পাঠায়ে দিলা। তাতে লাভটা কি হলো? সারাদিন ধরে যে পরিশ্রম করালে; পরিশ্রম করে আমি খুশী হয়েছি। তারপর বললে, ''নে, তোর জামা খোল। নিয়ে আয় তো বেত। দশখানা বেতের বাড়ি মেরে হুকুম হলো, বাড়ী চলে যাও''। এতে লাভটা কি হলো? বেটা সারাদিন খাটলো। শেষে দশ বেত খেয়ে চললো। কোন লাভই হলো না। খোরাক না পেলে,

এরকমভাবেই মন শুকিয়ে না খেয়ে মারা যাবে।

মন বলছে যে, ''আমারে তুমি খাটাও, দিনরাত খাটাও। আমি তোমার সংসারের সব কাজ খেটেখুটে করে দেব। তবে, আমার উপযুক্ত প্রাপ্য যা, সেটা আমাকে দিয়ে দাও। কামলা গিরি করে পাঁচসিকা, দেড় টাকা, দু'টাকা, আড়াই টাকা প্রাপ্য, সেটা দিয়ে দাও। সেটা দিয়ে আমি রেষ্টুরেন্টে গিয়ে রুটি খাই, আর যা ইচ্ছা খাই, তোমার তা দেখবার দরকার নাই।'' মনের উপযুক্ত যা দাম, যা দেওয়া দরকার, তা দিয়ে দাও।

সুতরাং সংসারের এই যে, কাজকর্মগুলি চলছে, দেখ দেখি, যে যা কিছু করছে, মন কেমন সুন্দরভাবে তা পালন করে যাচ্ছে। তার উপর হলো কি, তুমি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছ। মনটা বলছে, ''তুমি ঘুমাচ্ছ, ক্ষতি নেই। তুমি তো ঘুমাচ্ছ। নাক ডাকছো। আমি (মন) কেন ঘুমাবো? আমার ঘুমানোর ঠেকাটা কি'' মন বলছে, ''তুই বেটা ঘুমা।'' আমি কি ঘুমানোর জন্য এসেছি নাকি? তুই আমাকে সারাদিনটা খাটালি। তুই তো ঘুমিয়ে রইলি। ঘুমের মধ্যে এদিকে যায়, সেদিকে যায়, খোলা মাঠে যায়, আবার এসে ঘুম। আবার ধাক্কা দিল 'ওঠ্'। ঘুম থেকে উঠে আবার সারাদিনের জন্য মনকে কাজে লাগিয়ে দিল। কিন্তু বুঝতে পারছে না। কি সুন্দর সময়টা কিভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেখ, এভাবে এভাবে কি হচ্ছে? সময় তো চলে যাচ্ছে। থেকে থেকে, থেকে থেকে একেবারে নির্যাতিত হয়ে, কি হয়? পিষতে পিষতে দেহ একেবারে শেষ হয়ে যায়। তখন মন বললো, ''আমার সারাদিনে প্রাপ্য এইটুকু। তুই তো চলে আসলি। আর সারাজীবন আমায় নিয়ে এমনভাবে নাচালি যে, নাচতে নাচতে শেষ পর্যন্ত আমি খোঁড়া হলাম। সুতরাং তুই আমাকে খোঁড়া বানায়ে ফেললি। তারপর খোঁড়া বানায়ে কি করলি? তুই আমাকে (মনকে) রাস্তায় ফেলে

দিলি। রাস্তায় ফেলে দিয়ে তুই বেটা চলে গেলি। তুই বেটা শ্মশানে চলে গেলি। আমি কই (কোথায়) যাব? আমি যাব কই (কোথায়) ল্যাঁড়াতে ল্যাংড়াতে? আমার রাস্তাটা পরিষ্কার করে রেখে গেলি না?''

ওই বেটা (সেই ব্যক্তি) তখন কি করে? আবার এখান থেকে যে জিনিসগুলি সঞ্চয় হলো ওই মনের মধ্যে, সেরকম রূপ ধারণ করে। যে মাত্রায় গেল (মৃত্যু হলো), ওর সেই রূপটাই হলো। যার মধ্যে যে ছাঁচে ফেলবে, মন সেই ছাঁচ ধরে। এই সংসারের মধ্যে তুমি কি করলে? ছেলে হলো, মেয়ে হলো, ১০/১২টা বাচ্চা দিলে। তারপর ভোগ করলে। মন ভোগের মধ্যেই গেল। যত ইচ্ছা ভোগ করায়ে দিল। খুব স্ফূর্তি করলে। মন স্ফূর্তি করিয়ে দিল। খুব সুন্দর। মন তোমার সাথে সাথে চললো। তুমি মনকে নানাদিকে ছেড়ে দিলে। কতকিছু দেখলে। তোমাকে দেখায়ে দিল। কত খাবার খেলে। তোমাকে ইচ্ছামতন খাইয়ে দিল। ঘুমালে ঘুম পাড়িয়ে দিল। লোচ্চামি গুণ্ডামি করলে; করিয়ে দিল। চোর, চোট্টামি, বদমাইসি, গুণ্ডামি সবটাই করিয়ে দিল। যা করতে চাইলে, মন তাই করিয়ে দিল।

মন বলছে, আমাকে দিয়ে যা ইচ্ছা করাও, ক্ষতি নাই। আমি তাই করে যাচ্ছি। শেষবেলায় করলো কি, জিহ্বাটা বার করে মুখটা 'হাঁ' করে, খোঁড়া বানিয়ে চলে গেল। সেই ব্যক্তি তো রোগী। সে আর কি করবে? শেষে কি নিয়ে 'ও' যাবে? শেষে বুঝটা কি দিল? ছল বল কৌশল— সাততলা, পাঁচতলা, তিনতলা। মন বলছে, প্রথম থেকে শুরু করে, আমাকে দিয়ে যে ভোগ করালে, তাতে কি হল? আমি ভোগের মধ্যে এসে ভোগেরই হলাম। আমি ভোগের বহনকর্ত্তা হলাম। তোমাকে ভোগ করালাম; বললাম,

''বেটা, তুই ভোগ কর।'' আমি ভোগের ভিতর দিয়ে আসা যাওয়া করলাম। সেই রাস্তা হতে শুরু করে, যত গালিগালাজ, যত নোংরামি, সব শুনিয়েছে আমাকে। আর এইসব দিয়ে তার বোচকাখানা ভর্ত্তি করেছে।

শেষবেলা ওই বেটা তো গেল গিয়ে। আর আমাকে (মনকে) করলো কি, বোচকাখানা দিয়ে দিল। আমি তো নিয়ে এলাম, উপায় নেই। সারাজীবন আমাকে দিয়ে কি করালো? এখন মুস্কিল হলো চলে গিয়ে। 'ও' (সেই ব্যক্তি) তো চামচিকার রূপ ধারণ করেছে। মন সেখানেও আছে। মন বলছে, ''কি মুস্কিল, আমাকে কিসের মধ্যে আটকিয়েছে।'' সেই বেটা তো সারাজীবনের মনের সঞ্চয় বোঁচকার মধ্যে ভরে মনকে দিয়ে বের হয়ে গেছে। এখন হলো কি, আস্তে আস্তে মনটা এর মধ্যে (বোঁচকার মধ্যে) থার্মোমিটারের ডিগ্রীর মতো উঠতে থাকে; ওই বোঁচকার (মনের সঞ্চয়) সারের মাত্রা উঠতে থাকে। ওই সারটা নিয়ে তো উঠছে উঠছে। তারপর দেখা গেল আর কি? **যেখানে এক লক্ষ মাত্রা হওয়া উচিত, সেখানে দেখা গেল, একশত মাত্রায় গিয়ে ঠেকেছে। আর মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। মন বলছে, ''আমি তো আর উঠতে পারছি না।'' উঠবে কেমনে? খোঁড়া তো। একশত মাত্রায় গিয়ে দেখলো কি, এ্যাঁ, একখান চামচিকা। চামচিকার মাত্রায় গিয়ে আটকে রয়েছে। একশত মাত্রায় গিয়ে দেখলে, ''তোমার জন্ম চামচিকা।''**

চামচিকার মাত্রায় মনও গিয়ে আটকে রয়েছে। মন দুঃখ করছে, ''আমাকে দিয়ে সারাজীবন কত কাজ করিয়েছ। আমাকে খাটিয়ে নাচায়ে নুচিয়ে, খোঁড়া বানিয়ে রেখে, এখন চামচিকার ঘরে জন্ম নিলে।'' চামচিকার লাইন দিয়ে সে চলছে আর বলছে,

''কি রাস্তার মধ্যে গিয়েছিলাম।''

চামচিকা তো এমনি জীব, যে সারাদিন সূর্যের আলো দেখে না। যেখানে সূর্যের আলো দেখে খুব স্ফূর্তি হয়, সেখানে সে চক্ষু বুঁজে থাকে। মন বলে, ''এমনটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এলাম তো এলাম, এই অন্ধকারের মধ্যে। এখানে আমার (মনের) আসার তো কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কি করবো? উপায় নেই। আমি তো 'দাস' খাতাতেও আছি।''

সূর্যের আলোয় সবাই যখন উঠে দৌড়াদৌড়ি করে, সে (চামচিকা) তখন ঘুমায়। সকলে যখন ঘুমায়, 'ও' তখন বের হয়। বের হয়ে এমন কারবারের কারবার, যত বাড়ীর ফাঁক-ফোঁকর আছে, যত কলাবাগান আছে, গয়াবাগান (পেয়ারা বাগান) আছে, অন্ধকারের মধ্যে যেতে থাকে; আর যত লোচ্চামি, চোট্টামির মধ্যে গিয়ে পড়ে। সেখানে গিয়ে খায় আর কেমনে ওকে না দেখায়ে পালাবে, তার চেষ্টা করে। যার তার সাথে মারামারি করে, কিচ্‌মিচ্ করে, চিক্‌চিক্ করে। ওর স্বামী, তার স্ত্রী; ওর স্ত্রী, তার স্বামী, এই নিয়ে মারামারি করে। এই টোকাটুকি, ভোগলামি, চুরিচামারি, এসবের মধ্যেই থাকে। আরে আরে বেটা, তুই এমনি জন্তু যে, মানুষের মাথা থাকে উপরের দিকে, আর তোর মাথা থাকে নীচের দিকে। মন বলছে, ''তুই এমন ঝুলানই ঝুলাইছিস যে, তোর পিছনটা উপর দিকে, মাথাটা নীচের দিকে দিয়ে আমাকে (মনকে) তুই রেখেছিস।'' 'ও' এমনিই রয়েছে। আবার সেখান হতে বোঁচকা (মনের সঞ্চয়) নিয়ে উঠছে। মাত্রা উঠাচ্ছে, উঠাচ্ছে। মাত্রায় যাবে কই (কোথায়)? মাত্রা তো কিছু নেই। আর তো কিছু নেই। চলতে চলতে, চলতে চলতে একদিন শেষ হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল, কেঁচো হয়ে গেল। কেঁচোর মাত্রায় গিয়ে কেঁচো, জন্ম হল।

কেঁচোর আগা মাথা সমান। সে মাথা দিয়েও পিছনে যায়,

পাছা দিয়েও এগিয়ে যায়। মাথা দিয়ে পায়খানায় যায়। পাছা দিয়েও পায়খানায় যায়। এটার এমনই চেহারা যে, আগা মাথা প্রায় সমান অবস্থা। সুতরাং এটা আর মাত্রা উঠাবে কি করে? ব্যাস্, কোন কাজই হলো না। কি রকম একটা অবস্থা বুঝে দেখ। যতক্ষণ পর্যন্ত না মন, ওর খোরাক পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বোঝা নিয়ে ঘানি টানছে।

সেই কেঁচো কি করছে? গর্ত করে মাটি উঠাচ্ছে, আর বৃষ্টির জল পড়লে গড়াচ্ছে। ওই জলের তলে পড়ে আবার উঠছে। দেখা গেল, সাদা হয়ে, ত্যারা হয়ে মরে গেল গিয়ে। যেন আর কোন কাজই নেই; আর কিছুই নেই। মন তখন বললো, ''আমি এই যে একটা ছকের মধ্যে পড়ে গেলাম। উঠতেই পারছি না।'' দেখ তো দেখি। মনের কি অবস্থা।

Riot-এর (দাঙ্গার) সময় দুই সম্প্রদায় লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জলের থেকে যেই উঠছে, তার মাথায় একটা বাড়ি দিচ্ছে। এখন দেখা গেল, অনেকে উঠতেই পারলো না। উঠতে গেলেই বাড়ি (আঘাত) দেয়। 'মন' তো এটাই মনে করছে। **মন বলছে, ''আমি তো প্রত্যেক দেহের মধ্যে ঢুকে যাই। জন্মের পর জন্ম— এক একটা দেহ নিয়ে আসছি, আবার যাচ্ছি। আমি তো মাথা তুলতেই পারছি না। যেটার মধ্যে যাই, সেটাই আমাকে নিয়ে নাচায়।''** এই যে নাচানাচি— একেক জনের ভিতরে মনটা যা চেহারা করে না। তোমাদের যদি দেখার যন্ত্র থাকতো, তোমরা নিজেরাই তাজ্জব বনে থাকতে। একজন মহারাজাকে আটকিয়ে যদি নাচাও, তার যেমন অবস্থা, মনের অবস্থাও ঠিক তেমনই।

রাশিয়াতে স্ট্যালিন আছে না? স্ট্যালিনের নাম শুনেছ তো? এই স্ট্যালিন করতো কি জান? বুলগানিন আর ক্রুশ্চেভকে ওর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে নাচাতো। সবাই যার যার জায়গায় বসে

আছে। স্ট্যালিন বলতো বুলগানিনকে, 'নাচতো'। আর ক্রুশ্চেভকেও নাচাতো। তখন ভয়ের ঠেলায় ওরা নাচতো। তখন ভয়ের ঠেলায় ওরা নাচতে বাধ্য হতো। আর সকলে হাততালি দিত, আরাম পেতো, আর বলতো, ' বেশ, বেশ'। বুঝেছ তো? সেই ক্রুশ্চেভ, এখন কত বড়। সে-ই আবার অন্য সকলকে নাচায়। এই যে একটা অবস্থা, এটাই চলছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে।

আমরা কি করছি? এত বড়, বিরাট মনটাকে নিয়ে, সংসারের খপ্পরের মধ্যে রেখে, যেমন খুশী নাচাচ্ছি। এই মন, যে মন ভগবানের সত্তা, সেই বিরাটের মন, সেই বিরাটের মনটাকে সুবিধা মতো পেয়ে, আমরা প্যাঁচের মধ্যে ফেলেছি। আর ইচ্ছামতন এখন নাচাচ্ছি। ওকে (মনকে) যেমন বলা হয়, তেমনই নাচে। চুরি করতে যাবে, দেখ, কি সুন্দরভাবে চুরি করে নিয়ে এসেছে। ওরে দিয়ে যা করাও, তাই 'ও' করে যাচ্ছে। জেলখানার মধ্যে পড়লে, যা অবস্থা হয়, আর কি।

এই সংসারে সকল বেটাই তাই করছে। মনকে দিয়ে যা খুশী, তাই করাচ্ছে। মন জেলখানার মধ্যে পড়েছে। উপায় নেই। না শুনলে পাছার মধ্যে বাড়ি দেয়। এই হলো মনের এখানকার অবস্থা। **তোমরা মনটার উপযুক্ত খোরাকের ব্যবস্থা, যতক্ষণ পর্যন্ত না করতে পারবে, ততক্ষণ 'ও' (মন) এই ঘানির মধ্যে থেকে যাবে। আর শুধু থাকা নয়। আমরা নিজেও থাকছি, মনকেও রাখছি। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, এই সংসারে আসল বস্তু, সার বস্তুর সন্ধান করা।**

এই সংসারে আমরা যা করছি, কাজকর্ম করছি— সেটা তো দেখছোই। লক্ষ লক্ষ বাপ মা থেকে শুরু হয়েছে, এক কাজই করে গেল সবাই। এক কামই তো করলো। বাচ্চার পর বাচ্চা,

ছেলের পর ছেলে, মেয়ে। এখানে এই চললো, আর এই ঘরবাড়ী। এছাড়া নতুন কিছু করা হলো না। মন বলছে, ''আরে দেখ, নতুন কিছু তো করলাম না। এর মধ্যে সার বস্তু তো কিছু পেলাম না''।

সার বস্তু তো কেউ পাচ্ছে না। ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা নিবারণে যতটুকুনু যা দরকার, ততটুকুনুর মধ্যে মনটাকে ছেড়ে দিয়ে, খালি গুছিয়ে নিচ্ছ। সার বস্তু তো পাচ্ছ না। সার বস্তু খোঁজ। সারবস্তুর সন্ধান কর। এই যে ক্ষেত্রটা আছে, সংসার ক্ষেত্রটা— এই ক্ষেত্রের মধ্যে থেকে যা করছে সবাই, তুমিও তাই করছো। তারচেয়ে আশ্চর্যের কিছু, বেশী কিছু নয়। এর থেকে সার মর্ম, সার বস্তু বের কর। সেটা বের করে, তারপরে সেটা কাজে লাগাও। তখন দেখবে, উপযুক্ত ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। অসার বস্তু খুঁজতে খুঁজতে সার বস্তু পেয়ে যাবে।

এখন যদি বল, এটার (সংসারের) মধ্যে কি সারটা আছে যে, খুঁজলে পাওয়া যায়? হ্যাঁ, এটার মধ্যে সার আছে। কি সার আছে? জান তো, একদিন বলেছিলাম, দুধ মন্থন করলে মাখন বের হয়। মাখন যখন বের হয়, তখন মাখনটা কোত্থেকে এল? খুঁজতে গেলে দুধটা আসে। দুধ খুঁজতে গেলে গরুটা আসে। গরুটা খুঁজতে গেলে গরুর নাড়িভুরি থেকে শুরু হয়। তারপর রক্ত থেকে শুরু করে হাড্ডি, মজ্জা, মাংসে গেছে গিয়ে। দুধ কিন্তু মিশে গেল। দুধ নাই।

প্রথমে মাখন, তার আগে দুধ। তার আগে গরু। গরুর হাড্ডি, রক্ত। রক্তের থেকে শুরু করে হাড্ডি, মজ্জা, মাংসে চলে গেল দুধ। দুধ কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে এল কিন্তু ঘাস, বুঝলে? এই ঘাসে এলাম। এখন ঘাস খুঁজতে গিয়ে দেখি, আরে বাবা, ঘাসও নাই। মাটিতে গেল। মাটিও বলছে, ''আমি তো না। আমি

তো দুধ না।''

—তবে বেটা, তুই কেটা (কে)?

মাটি বলে, ''জল, বাতাস, আগুন— এই মেশানোই আমি।'' দুধ খুঁজতে বের হয়েছি। দুধ কই? দুধ বললো, ''আমি তো আমিই না। জলে যাও দেখ।'' জল বলে, 'আমি তো না।' বাতাস বলে, 'আমি তো না।' সবাই বলে, 'আমি তো না।' তবে কেটা (কে)?

মাখন বলে দুধকে, 'আমি তোমার মধ্যে ছিলাম।' দুধ বলে, 'আমি তো না। আমি গরুর মধ্যে ছিলাম।' আমি গরু খুঁজতে গেলাম। গরু বলে, 'আমি কি জানি? রক্তের মধ্যে যাও।' রক্ত বলে, 'আমি কি জানি? হাড্ডি, মাংসের মধ্যে যাও।' তারা বলে, 'আমরা কি জানি? ঘাসে যাও।' ঘাস বলে, 'আমি জানি না। মাটিতে যাও।' মাটি বলে, 'আমি জানি না। জলে যাও।' জল বলে, 'আমি জানি না। বাতাসে যাও।' সবাই বলে, 'আমি জানি না।' তবে জানে কে? এই তো কথা, আসল বস্তু কোথায়? আসল বস্তু খুঁজতে গেলে খুঁজে আর পাবে না।

আসল বস্তু খুঁজে পাওয়া যায় না ব'লে, এটাই আসল। কি আসল? এই যে খুঁজতে খুঁজতে যাচ্ছ, এটাই আসল। খুঁজতে খুঁজতে যেখানে গিয়ে আর খুঁজে পাবে না, সেটাই হলো আসল সন্ধান। খুঁজতে খুঁজতে যাও। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার খোঁজে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অনুসন্ধানের সন্ধানে থাকবে। হ্যাঁ, অগ্রসর হয়ে যাও সন্ধানের দিকে। সেখানে গিয়েও যদি খুঁজে না পাও, সেখানে গিয়েও থেমে যেও না। আর নিরাশ হয়ে ফিরে এসো না। কারণ তুমি তো একটার পর একটা বস্তু পাচ্ছই। কাজেই আরও খোঁজে যাও। ব্যাপার হলো, সন্ধান। অনুসন্ধানের সন্ধানই

হলো, একমাত্র কাজ, একমাত্র কার্য। সেইদিক দিয়ে যদি ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে যাওয়া যায়, তবে সারবস্তু তখনই মিলতে থাকে। প্রত্যেকেই বলছে, 'সারটা কোথায়?'

এই সংসারের মধ্যেই একটা সার আছে। নামটা যখন 'সংসার', তখনই তার একটা সার আছে। হ্যাঁ, সেই সঙ্, সেই সঙের (সং-এর) মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে যাও। এই সং-এর মধ্যে গিয়ে সার পাবে। এই সার খুঁজতে খুঁজতেই দেখবে তুমি, সংসারের এই রূপটাই সংসারের নয়। তবে কোন্ রূপ? এই রূপটা নয়। এই রূপের পর আর একটা রূপ আছে। সেই রূপের কাছে যাও। সেই রূপ বলে, ''আমার এই রূপ নয়।' তারপরের রূপে যাও।'' ক্রমশঃ ক্রমশঃ তুমি রূপের দিকে যাও গিয়ে। রূপ খুঁজতে খুঁজতে অপরূপের মাঝে, বিশ্ব বিরাটের মাঝে বিলীন হয়ে যাবে। মন তখন বুঝলো, 'এখন একটু খোরাক পাচ্ছি।' এখন আর মন বিশ্রাম পাচ্ছে না। সে একটার পর একটা, একটার পর একটা অনুসন্ধানের সন্ধানের দিকে যাচ্ছে। এতদিন পরে সে খোরাকটা পাচ্ছে। আর এই জন্ম-মৃত্যুর ছকের মধ্যে মনকে রেখে দিলে, খোরাক পাবে কি? কিছুই পাবে না।

এই যে অনুসন্ধানের সন্ধানে যেতে যেতে একটার পর একটা সে পেয়ে যাচ্ছে, তাতেই ক্রমশঃ সে (মন) ভরাট (solid) হতে চলেছে। এই যে ক্রমশঃ ক্রমশঃ পাওয়ার মাঝে পেয়ে পেয়ে যাচ্ছে, তখন কি হয়? পাত্রটিও তখন তার সেই অনুযায়ী হয়ে যায়। হুঁঃ, যে রকমটি ক্ষমতা, সেরকমটি (সেই ছাঁচটি) ধারণ করতে থাকে। তখন কি হলো? তোমার মনটা, মনের পাত্রটা যতটুকুনু ছিল, তারচেয়ে আরও বড় হয়ে গেল। কারণ পাওনা বেশী হয়ে গেল। মনও অনেক বড় হয়ে গেল। বড় হওয়ার সাথে

সাথে দেহের ভিতরে যতগুলো অণু পরমাণু আছে, যতগুলো পাত্র আছে, সব বেলুনের মতন ফুলতে আরম্ভ করলো। তখন করলো কি, মন দেখলো, 'এবার ঠিক আছে।'

তারপর সেই ব্যক্তি যখন দেহ ফেলে চলে গেল, মন তার সারাজীবনের মনের সঞ্চয়ের (বোঁচকার) ছাঁচটা নিয়ে নিল। দেহ ছেড়ে দিলে কি হয় জান? মাত্রানুযায়ী আবার জন্ম হয়। এবার মাত্রাটা বেশী হয়েছে। মাত্রাটা সাঁ করে চলে গিয়ে দেখলো যে, ৮০,০০০ মাত্রায় গেছে, যেখানে এক লক্ষ মাত্রা হওয়া উচিত। যেমন হাউই বাজি সোঁ করে চলে যায়, তেমনই আর কি। এবার মন বুঝেছে। বলছে, ''বাঃ বাঃ, আশি হাজার মাত্রায় গিয়ে ঠেকে আছে। আরও কুড়ি হাজার মাত্রা হতে হলে একটা ধাক্কা দেব। আশিতে যখন এসেছি, এখন দেখি, আর কুড়ি হাজার হলে কি হয়।''

সেখানে এসে দেখলো, সাতটা শক্তির অধিকারী হয়ে গেল। সাতটা শক্তির অধিকারী হয়ে গেছে যখন, মন বললো, ''আচ্ছা, একটু বসলাম।'' আবার নীচের দিকে চেয়ে দেখে কি— ওই সংসারের যত সব ঢেউ। ঐখানে উঁচু হতে তাকিয়ে দেখে, সবার দিকে কেবল তাকায়। দেখে, পোকার মতন কিলিবিলি কিলিবিলি করছে সব। ময়লার গামলা দেখেছ না? পোকাগুলো কেমন কিলিবিলি করে। দূর থেকে এই দেখে, ভীষণ অবাক হয়। ভীষণ ভয় লাগে ওর (মনের)। পোকাগুলোর কিলিবিলি যখন দেখে, একটার পর আর একটা, কেমন উঠছে নাচছে। মনে হচ্ছে, বেশ আনন্দ পাচ্ছে। খুব স্ফূর্ত্তি করছে। দূরের থেকে যখন দেখে না, মন শিউরে উঠে বলে, ''বাপ্‌রে বাপ্‌ কিসের মধ্যে ছিলাম''। লোমকূপ কাঁটা দিয়ে ওঠে।

তারপর সাতটা শক্তির অধিকারী হয়ে মন সেখানে বসলো। বসে বললো, ''আর একটা টান তো মারি। সাতটায় তো আছি। আর এক টান দিতে পারলেই তো এক লক্ষে উঠবো।'' তখন করলো কি, দিল এক টান। এখন তো এসে পড়েছে। চলতি গাড়ীতে উঠেছে, যাবেই। সে দেখে যে, আস্তে আস্তে করে উঠছে। দেখা গেল, কয়েক বৎসর পর সাঁ করে এক লক্ষ মাত্রায় উঠে গেল। আটটা Power, আটটা শক্তি সম্মিলিত হয়ে গেল, মিশে গেল। এখানকার আটটা স্তর আছে। আটটা স্তর মিলে গেলে সে করলো কি— তখন সেই এক লক্ষ মাত্রা হতে সবদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

বেশ সুন্দর সবকিছু দেখা যায়। কত কত আত্মা কিভাবে যে আসা যাওয়া করছে। বাপ্‌রে বাপ্‌। **এক লক্ষ মাত্রায় কি হয়? তখন দেখা গেল যে, অজস্র অজস্র মহাপুরুষ, বিরাট বিরাট মহাপুরুষরা এই শূন্যে ভেসে যাচ্ছে। সুন্দর ভেসে ভেসে যাচ্ছে বিরাট বিরাট এক একজন মহাপুরুষ, কত খুশী। তারা তোমাকে দেখে বলছে, ''এসেছ তুমি। বেশ, বেশ। কাজ কর,কাজ কর।''**

আবার দেখা গেল, কত রকম মহানরা এক জায়গায় সব সম্মিলিত হয়েছে। তখন তোমার ডাক এল, 'তুমি এখানে এস। দেখ এসে।' সেখানে গিয়ে দেখলে, এখানকার শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শিব— সব এসেছে। আরও কত লক্ষ লক্ষ পৃথিবীতে এরকম কত শ্রীকৃষ্ণ, শিব আছে। শিব করলো কি, এসে তোমার কাঁধে থাপ্পর দিয়ে বললো, ''হ্যাঁ, তোমার দেশে গিয়েছিলাম। এসেছ এখানে, বেশ বেশ বেশ।'' বুদ্ধ এসে কথা বললো। তুমি বললে, ''আপনিই বুদ্ধ?'' শ্রীকৃষ্ণকে বললে, ''আপনার জন্য কত খোল ফাটিয়ে ফেলেছি, মৃদঙ্গ ফাটিয়ে ফেলেছি। বৃন্দাবনে গেলাম,

মথুরায় গেলাম। কত দেখেছি। ইস্ কত লীলা।'' কৃষ্ণও বললো, ''বেশ বেশ। খুশী হলাম।'' মহাপ্রভু এসে উপস্থিত হলেন, ''হ্যাঁ, কত লীলা করেছি। বেশ, তুমি এসেছ। এই যে আসতে পারছো, এতেই আমি খুশী। কত চেষ্টা করেছি। ওরে, সবাইকে সেখান হতে আনার জন্য কত চেষ্টা করেছি। কিন্তু তবুও আসে না তো, উঃ।'' আরও কত মহাপুরুষ এল। সবাই এসে খুশী হয়ে গেল।

মনে কর, পার্বতী আসলো। এই পার্বতী দক্ষ রাজার মেয়ে। পার্বতীকে বললে, ''আপনি পার্বতী? সার্বজনীন পূজার জন্য কত চাঁদা তুললাম। কি যে করেছি— ইস্। আর পূজা কতই করলাম।'' পার্বতী তোমাকে বলছে, ''পূজা কর তোমরা সেখানে। আর আমি দেখতাম, তোমরা ডুবাতে যাচ্ছ। ভাসানের মধ্যে আমাকে ডুবাচ্ছ। বছরে একবার পাড়িয়ে (মারিয়ে) পাড়িয়ে মূর্ত্তি তৈরী কর। আবার আমাকে শেষে নিয়ে গঙ্গায় ডুবাও; এই তো দেখি আমি। সারা বছর ধরে এই একটাই দেখি আমি।''

এই তো লক্ষ্মী এল। তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে বললে, 'ইস্ তুমি? না খেয়ে মরছি।'

—কেন? না খেয়ে মরছো কেন?

—আমি না খেয়ে মরছি। মাকে খাওয়াতে পারি নাই। বাবাকে খাওয়াতে পারি নাই। দেশে দুর্দিন। তুমি একবার দেখ নাই।

লক্ষ্মী বলে, 'হ্যাঁ, দেখেছি।'

—দেখেছ? তবে কি করেছ?

লক্ষ্মী বলে, 'আমি যেদিক দিয়ে দিতে যাব, সেদিকের কাছ দিয়েও তারা থাকে না। আমি দেব কাকে? আমি দিতে গেলেও নিতে পারে না। তাহলে কি করবো? আমি বহু চেষ্টা করেছি দিতে।

কিন্তু তারা নিতে চায় না এবং নেয় না।'

কথা ঠিকই। আজকে দেশের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখ, কত ক্ষেত খামার, কত খালি জায়গা, জমি পড়ে আছে। সেখানে চাষের ব্যবস্থা না করে অন্য দেশ হতে খাবার নিয়ে আসছে। এদিকে তাদের কোন ব্যস্ততা নেই। কেমনে পরের বাড়ীতে গিয়ে ভিক্ষা মাগবো, আমাদের দেশ তাই নিয়েই ব্যস্ত। নিজের দেশের মধ্যে সুবন্দোবস্ত করবে, খাওয়ার ব্যবস্থা করবে, তার কোন চেষ্টাই নেই, বুঝলে? এত ক্ষেত খামার পড়ে আছে, এত অনাবাদী জমি পড়ে আছে যে, ঠিকমত ব্যবস্থা করে চাষবাস করলে, এখনও দুই টাকা মণ চাল খাওয়াতে পারে। কিন্তু তা করলে ওদের গদী নষ্ট হয়ে যাবে। যে মুহূর্ত্তে দুই টাকা মণের চাল করবে, তাদের ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে। এরা করে কি, যাতে ব্যবসাটা চালু থাকে, তার জন্যই জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়।

লক্ষ্মী বলে, 'আমি তো খাবার দিতে চাই। বেটা, তোরাই তো খাওয়া বন্ধ করিস। আমি খাওয়াব কি? আমার যা আছে, তাতে তোরা বিনা পয়সায় খেতে পারিস্।'

সরস্বতী এল। সরস্বতীকে দেখে তুমি বললে, ''মাগো, দেশে এত অন্যায়, দুর্নীতি চলছে, মানুষের মাঝে একটু সুবুদ্ধি তো দিতে পার।''

সরস্বতী বলে, ' শেখাবো কাকে? জীবনভর তো কিছুই করলো না। লেখাপড়া তো কিছুই করতে পারে নি। ঘুম হতে উঠেই গালিগালাজ শুরু করে। স্বামীকে স্ত্রী, স্ত্রীকে স্বামী যা তা বলছে, ঘুম হতে উঠেই। আমি যাব কোন্ দিক দিয়ে? রাস্তাই তো নেই।'

এই তো গেল এই দেশের অবস্থা। এই পৃথিবী একটা

গেল। আরও লক্ষ লক্ষ পৃথিবী আছে। আবার হয়তো এমন এক জায়গায় গেলে, তাদের কাছে পরিচয় পত্র দেওয়াতে, বেশ একটা অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়ে গেল। এমনই জায়গা, যেখানে কেউ বুড়ো হয় না। কোন রোগ নেই, শোক নেই। একটা হাঁচিও দেয় না কেউ। সবসময় একটা বয়সে থাকে। একই জায়গায় একই বয়সে থাকে।

এই যে সূর্যটা, এটা কি বয়সে বুড়ো হয়ে গেছে? তাহলে কি আর উপায় ছিল? তাহলে কে আলো দিত? এই বেটা সাত, আট লক্ষ বছর ধরে একই জায়গায় আছে। এই সূর্য একই আছে। এর যদি দাড়ি পাকতে আরম্ভ করতো, তাহলে তো সবই শেষ হতো। প্রথম হতে শুরু করে, সকল অবতার, ভগবান সবাই এটাকে এরকমই দেখে গেছে। সবাইকে সূর্য বলছে, ''আমি একই আছি।''

সূর্য যেমন এক থাকে, তুমিও সূর্যেরই তো। ওরকমই তো শক্তি। তুমিও তখন একটাই থেকে যাবে; একটাই থাকবে। সুতরাং তুমি যখন সেখানে গিয়ে বসলে, তোমার মনে হলো, 'চমৎকার'। সেখানে কি হলো? সেখানে হাজার হাজার মহাপুরুষ আসলেন। সেখানে আবার মীটিং হয়। মহাপুরুষদের মীটিং হয়। কেমনে হয়? **এখন এই যে পৃথিবীগুলো চলছে চতুর্দিকে, শুধু এই একটা পৃথিবী তো নয়, লক্ষ লক্ষ পৃথিবী আছে। ঐ মহাপুরুষরা তাদের শক্তির দ্বারা চালিত করতে থাকে। তাদের শক্তির দ্বারা চালায়। এই ইউনিভার্স (Universe) হতেই তারা শক্তিটা নেয়। নিয়ে তারা শক্তিটাকে বাড়ায়।** বাড়িয়ে করে কি?

যেসব মহানরা মনন শক্তিকে solid করে, বিবেকের সুরে সুর মিলিয়ে, সেই ছাঁচে ছাঁচ নিয়ে দেহধারণ করে রয়েছে, তাঁদের যে যন্ত্রগুলি রয়েছে, সেই যন্ত্রগুলি করে কি? যন্ত্রগুলি দিয়ে তাঁরা

অন্য যন্ত্রগুলিকে তুলে নিয়ে আসে। ক্রেণ (crane) দেখেছ না? ক্রেণ দিয়ে কেমন তুলে আনে। একে দিয়ে ওকে উঠায়। দেখেছ তো? এও ঠিক তাই। ইউনিভার্সের শক্তি থেকে শক্তি নিয়েই, এটাকে বাড়িয়ে নিয়ে, আবার এই শক্তিগুলোকে ধরে ধরে জায়গায় জায়গায় বসিয়ে দেয়। কথা বুঝলে? মনন শক্তির এই ক্রেণ দিয়ে সমস্ত মহানরা, মহাপুরুষরা এই কাজ করে। এই শক্তি থেকে শক্তি নিয়ে, শক্তি তৈরী করে। বুঝেছ তো? যেমন, লোহাকে গালিয়ে ঢালাই করে, সেই লোহা দিয়ে কড়াই তৈরী করে। আবার সেই কড়াই-র মধ্যে লোহা গলানো হয়। বোঝ, কি পদার্থ। লোহার কড়াই বলে, 'যত তাপই দিক, আমি গলবো না। তোকে গলাবো।' 'ও' (কড়াই) গলায়, নিজে গলে না। এটা হলো খনি; মহাশূন্যের অনন্ত খনি। খনি থেকে লোহা গলিয়ে, সেই গলানো লোহা হতেই পাত্র তৈরী করলে। এই পাত্রের মধ্যে আবার লোহা গলাতে আরম্ভ করলে। টগবগ করে লোহা গলাচ্ছ। গ্লাসে করে এক গ্লাস লোহার সরবৎই খাইয়ে দিলে। জলই তো দাও। তরল লোহার সরবৎ দিলে, কিন্তু যাকে দিলে সে বললো, 'লোহার সরবৎ খাবো?' তুমি তো খেতেই দিয়েছ। এমন দেশও আছে, যেখানে মানুষ লোহার সরবৎ খায়।

এই জল শূন্য থেকে মহাশক্তি নিয়ে তৈরী। এই মহাশক্তি দিয়েই জগতের সমস্ত জিনিস চালিত হয়। সবকিছুই তো চলছে। তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন তো। সেখানে **মহাপুরুষদের বিরাট বিরাট সভা হয়। যতসব শিব, এখানকার শিবের মত কত শিব যে সেখানে আছে। একটা ফুঁ দিলে কত মহাদেব, কত পৃথিবী বেরিয়ে যাবে। ধুলা বালির মতন বেরিয়ে যাবে।** আরও কত পৃথিবী তো আছে। কত বাপ্ রে বাপ্। বিরাট বিরাট পৃথিবী।

একটা সুবিধা হলো, সকলের সঙ্গে দেখা হবে। সবাই তোমাকে ভালবাসবে। তখন আর কি। ইচ্ছা মতন যাওয়া আসা করতে পারবে।

এই মহাপুরুষদের মধ্যে আবার Competition হয়। একজন মহাপুরুষ কর্তা হলেন, প্রেসিডেন্ট (সভাপতি) হলেন সবার উপর। মনে কর, বিশ লক্ষ মহাপুরুষ একত্রিত হয়েছেন। কিরকম মহাপুরুষ জান? এমন এমন মহাপুরুষ আছেন, যাঁরা একটা ফুঁ দিলে কয়েক কোটি পৃথিবী হয়ে যাবে গিয়ে। এইরকম ক্ষমতা এক একজনের। সব তো ওখানে গিয়ে বসেছে। তোমরা কোনরকম করে একবার যদি যেতে পার; ধরে ধরে কোনরকমে যদি বৈতরণী পার হতে পার, তবে তো পারলেই। ব্যাস্, যদি সেখানে গিয়ে একবার দেখতে পার, তবে দেখবে যে, বাপ্‌রে বাপ্। তারপর প্রধান (কর্তা) মহাপুরুষ যিনি, বলে দিলেন, ''তোমরা এই কাজটা কর। বার বৎসর পর আবার তোমাদের হিসাব নেব।'' সবাই কাজে নেবে গেল বার বৎসরের জন্য। বার বৎসর পর আবার সবাই একত্র হলো। তার মধ্যে কে first বা প্রথম হলো? কে প্রথম হলো?

দেখ, এর মধ্যে যে প্রথম হলো, সে একটা বড় Post পেয়ে গেল। সেখানে চাকুরী বাকুরী অনেক আছে। এই গভর্ণমেন্টের মতো, বিশ্ব প্রকৃতির গভর্ণমেন্ট আছে তো। ভাল ভাল চাকুরীর Post সেখানে খালি আছে। ইচ্ছা করলে কত চাকুরী নিতে পার, কত চাকুরী করতে পার, অপেক্ষা করতে হবে না। সেখানে গেলেই ভাল ভাল চাকুরী পেয়ে যাবে। দেখবে, কি সুন্দরভাবে সব চলছে। একেবারে কত সুন্দর, কত চমৎকার লাগবে। মাঝে মাঝেই সেখানে মহাপুরুষদের মীটিং হয়। মনে কর, ৮নং পৃথিবী আছে। মহাপুরুষদের মধ্যে একজন বললেন, ''যাও, তোমরা ৮নং

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে কিছু নিয়ে এস।'' বিরাট বিরাট মহাপুরুষদের ছেড়ে দিল ছুঁৎ করে। আর ওঁরা নীচে নাবতে নাবতে ৮ নং পৃথিবীতে এসে পড়লো। এসেই একজন এখানে গেল। একজন সেখানে গেল। সেখানে তারা অতি সাধারণ হয়ে জন্মগ্রহণ করলো। আর রোগ, শোক, দুঃখ-ব্যথার মধ্যে জীবন কাটিয়ে মৃত্যুকালে সারাজীবনের মনের সঞ্চয় বোঁচকায় ভরে ঐ দেহ ছেড়ে চলে এল। এই করে করে সমানে চলতে থাকে।

আর সেখানে কি আনন্দ, কি সুন্দর, কি ভাব, কি চমৎকার। আরে বাপ্, আনন্দের কোন সীমা নাই। এখানে সমুদ্রের ঢেউ যেমন লোনা জলের বাড়ি খেয়ে এসে পড়ে, আর ওখানে আছে আনন্দের ঢেউ। আনন্দের একটা সাগরই আছে বিরাট। আবার ওটার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে অনেকে আনন্দ করছে। অনেকে আবার সাঁতার দিতে খুব আনন্দ পায়। বলে কি, কোন পরিশ্রম হয় না। সারাটা দিন যায়। ঝিম মেরে বসে আছে। আরে বাপ্‌রে বাপ্, ফোয়ারার মত স্ফূর্তি ছুটছে। কোন দুঃখ নাই। আর যার যা ইচ্ছে, তাই হচ্ছে। ক্ষণে বাতাস হয়ে যাচ্ছে। ক্ষণে ফুল হয়ে যাচ্ছে। একবার মহাপুরুষরা সকলে ঠিক করলেন, 'বাগানের মধ্যে ফুল হয়ে থাকবো'। তাঁরা সবাই ফুল হয়ে বসে গেছেন। সব ফুল। বুঝেছ? সবাই ফুল হয়ে গেছেন।

কারণ মন ইচ্ছাধীন। এখন বোঝ, এই ইচ্ছাধীন যাঁরা ওখানে গেছেন, তাঁরা কিন্তু এখানকার (পৃথিবীর) এই বাটনা (রোগ শোক, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেই) বেটেই গেছেন। যতগুলি গেছেন সেখানে, সব বাটনা বেটে গেছেন। তাঁরাই এখানে যখন ছিলেন, দেখ গিয়ে, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ছুটছেন। এইসব কাজ সবারই করতে হয়েছে। যতগুলি বড় হয়েছে

এখান থেকে, এই বাটনা সবারই বাটতে হয়েছে। সবাই কয়, 'সংসারের বাটনা না বাটলে পেষা আর হবে না।' বাটনা বাটতে তো পেষণ চাই। পিষে যখন মোলায়েম হবে, তখন বলে, 'হ্যাঁ এইবার ঠিক বাটা হয়েছে।'

এই সংসারটা হচ্ছে শিল-নোড়া (পাটা-পুতা)। তোমরা কও না (বল না), শিল-নোড়া। এই শিলে (পাটায়) একেবারে ঠেসে পিষতে হবে। ধুনুরী তার যন্ত্রে তুলাগুলিরে ধুনায় না? পিষতে পিষতে হুঁ হুঁ হুঁ করে, এই ধুন্ ধুন্ করতে করতেই ধুনে যাবে গিয়ে; ধুনিয়ে (পিষে) একেবারে মোলায়েম করে ফেলবে। এখন হয়েছে কি, **আমরা এখানে এসেছি ঠিক। এসে সংসারের পেষণ যন্ত্রে আমরা পড়েছি। আমাদের এই সাজানোটা সবই ঠিক আছে। কিন্তু আমরা পেষার যন্ত্রে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। অথচ আমরা এমনই যে, পেষার যন্ত্রে পড়েও পিষ্ট হই না। বুঝেও আমরা বুঝি না।**

আদা এমনই একটা জিনিস যে, শুকিয়েও এটার তেজ থাকে। শুকিয়ে ধুতরা হয়ে গেছে। তবুও এটার তেজ কমে না। এখন হয়েছে কি জান? আমরা আদার মতন ধুতরা (শুকিয়ে) হয়ে গেছি। ধুতরা হয়ে যাওয়াতে পিষতে গেলেও আমরা ছেঁচা খেয়ে বাঁকা হয়ে থাকি। অনেক সময় জল দিয়ে পাটায় (শিলে) পেষে। আবার বেশী ছেঁচতে গেলে পুতাটার (নোড়াটার) মধ্যেই লেগে থাকে। এমনই একটা বাড়ি দিচ্ছে যে, এটার (সংসারের) মধ্যে লেগেই আছে। যতবেশী বাড়ি দেয়, ততবেশী এটার (নোড়াটার বা সংসারের) মধ্যে লেগে, আটক হয়ে আছে। এটা হতে আর বের হয় না। এখন বোঝ, পিষলেও আমরা মোলায়েম হতে চাই না। আবার বেশী পিষতে গেলে, ধুস্ করে চলে গেল

একদিকে, আর খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন বলি, 'যাঃ, দূরে চলে গেল। এখন রাঁধবো কি করে?' মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এখন ছেঁচা খেয়ে, ওটার মধ্যে লেগে থাকে, নাহলে স্যাঁৎ করে দূরে চলে যায়— এই দুটোর মধ্যে আমরা আছি। এখন আমরা হয় বের হয়ে গেছি, নয় চ্যাপ্টা খেয়ে রয়েছি। পেষা আর হচ্ছে না। পিষে যদি ফেলতে পারতো, তবে দেখতে মোলায়েম হয়ে যেত।

রান্নায় লাগে হলুদ। তারপর থাকে মরিচ— কি কারবার। সম্পর্কটা দেখ, একটা রোগ সারায়। আর একটা রোগ বাড়ায়, বুঝলে? হলুদ রোগ সারায় আর মরিচ রোগ বাড়ায়। আবার দুটো এক জায়গায় রাখে— বড় ভাই, ছোট ভাই। তারপর করে কি— আবার এক জায়গায় দুটোকে মাখে। মরিচের দোষটা হলুদ কমায়। আর হলুদের গুণটা মরিচ কমায়। দুটোকে এক জায়গায় মেখে টেখে, এক জায়গায় সম্ভার দেয়। তেলে এটারে ভাজে। ভেজে আর একরূপে রূপ নিয়ে এটা চলে যায়। এখন এখানে হলুদও আছে, মরিচও আছে। দুটো এক জায়গায়ই থাকে। কিন্তু দুটোর সঙ্গে মেশে না কখনও। দু'টোর আলাদা গুণ, আলাদা কাজ, আলাদা সব। কিন্তু স্বাদ গ্রহণের জন্য আমরা কি করি? অনেক সময় এটাকে (হলুদকে) পিষে ফেলাই। সবাই কি আর বাড়ি খেয়ে চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে যায়? ছুটে যায় না? অনেক সময় আমরা পিষে যাই গিয়ে। ঐ মরিচটা এনে ওটার সঙ্গে হলুদ মিশায়ে দিল। হলুদ মিশায়ে দিলে কি হলো? হলুদের কিছু গুণ নষ্ট হলো। মরিচের ঝাঁজ একটু বেশী। শুকনো মরিচের (লঙ্কার) গুণের জ্বালা তো বুঝই। না পেটে সহ্য হয়, না পায়খানা করতে সুবিধা হয়, না প্রস্রাব করতে সুবিধা হয়। এটা কোন কাজেই লাগে না। আর

জিহ্বায় দিয়ে মনে হয়, এটার মধ্যে গেছিলাম কিসের জন্য? ছিলাম শান্তিমতন, কেন গেছিলাম? এমন সব মরিচ আছে আমাদের, পিষে ফেললে, যা কিছু আছে, সব গোলমাল করে দিয়ে, শেষে আর একটা রূপ নিয়ে বের হয়ে যায়।

তাই বলছে, এই সংসারের যাঁতা কলে (পাটা পুতায়) পেষি আমরা। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই যন্ত্রের মধ্যে দশন সংস্কার না হচ্ছে, ততক্ষণ পরিপূর্ণতা আসবে না। এই যে, দাঁত মাজে, এটাই হলো দশন (দাঁত) সংস্কার। এই **দশন সংস্কার যতক্ষণ পর্যন্ত না হয়েছে, অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয়ের সংস্কার করতে না পারছো, ততক্ষণ মনকে তার খোরাক দিতে পারবে না। এই পাটা-পুতায় ছেঁচে, দশটা ইন্দ্রিয়ের সংস্কারকে চূর্ণ করতে হবে।** তারপর এই দশটা ইন্দ্রিয়ের সংস্কারকে যখন চূর্ণ করবে, এটা তখন Powder হয়ে যাবে। Powder হলেই বুঝবে চূর্ণ হয়েছে, দশটা ইন্দ্রিয়ের দর্প চূর্ণ হয়েছে। এবার চূর্ণ হয়ে গেছে। চূর্ণ হলেই পেটেন্টে আসছে। এই চূর্ণ করেই কিন্তু নানারকম বটিকা তৈরী করা হয়। তখন দেখবে যে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ এই চূর্ণ করেই যত সকল হয়েছে— অমুক বড়ি, তমুক বড়ি; এই কৃষ্ণ চতুর্মুখ, যোগেন্দ্ররস, ভুবনেশ্বর— আরও কত কি। চূর্ণ করেই কিন্তু হয়।

এই কৃষ্ণ চতুর্মুখ করলো কি? 'হা কৃষ্ণ', 'হা কৃষ্ণ' কত করেছো। কৃষ্ণবটিকা তো হলো। এখন এই কৃষ্ণবটিকা তৈরী হয়ে গেলে তোমরা পেলে। বটিকাটি যখন কৃষ্ণবটিকা হলো, সেই কৃষ্ণ হলো রুচি। রুচিতে যখন পরিপূর্ণতা হলো এবং সে-ই যখন দেবতা; তখন দেবতা-ভাবাপন্ন দেশে দৈবশক্তি সেই বটিকায় নিবিষ্ট হলো এবং সেই বটিকা তোমার মধ্যে ফেলে (সেবন করে) , তাজা হয়ে গেলে। একেবারে বেশ সবল হয়ে বের হলে। বাপ্

রে বাপ্। এখন যেসব চূর্ণ দিয়ে বটিকাটি তৈরী হলো, তার মধ্যে কত কি আছে। খুঁজতে খুঁজতে গেলে দেখবে, খুঁজে আর পাচ্ছ না। খুঁজতে খুঁজতে দেখবে, ঘাস বলছে, 'এতদিন তো ভালই ছিলাম। যাঁতা দিয়ে আমাকে লম্বা করে ফেলেছে। ঐ যে চাপ, তা দিয়ে এমন লম্বা রূপ করে ফেলেছে, সেটা আমার দরকার নেই। ঐ সূর্যের আলো, আস্তে আস্তে পেলেই আমার ভালো। অন্যদিকে যাঁতা খেয়ে লম্বা হওয়া ভাল নয়।' এখন সেই যে, সেই বটিকাই হলো সবচেয়ে সুন্দর বটিকা। এটাই যতক্ষণ পর্যন্ত না বের হবে, ততক্ষণ কিছুই হবে না।

এই সংসারের সার আছে, মর্ম আছে, মর্মার্থ আছে এবং এর মধ্যে পরিপূর্ণতা আছে। এই পরিবেশ থেকে, সংসারের এই পরিবেশ থেকে কি করতে হবে? তোমার বেশ তৈরী করতে হবে। বেশ তৈরী করবে এবং এটাই পরিধানে এনে পরিধান করতে হবে। এটা দিয়ে আমাদের সাজসজ্জা এখান থেকে তৈরী করতে হবে এবং এখান থেকেই আমাদের রূপ তৈরী করতে হবে। এই রূপ থেকেই সেই রূপে রূপান্তরিত হতে হতে, সেই স্বরূপের স্বরূপত্বে গিয়ে পৌঁছাতে হবে এবং সেখানে স্বরূপত্বে পৌঁছালে, তোমরা স্বরূপত্ব সম্পর্কে যদি জ্ঞাত হয়ে যাও, তাহলেই হলো। স্বরূপত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে গেলেই, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। মন তখন তার নিজের রূপটাকে জানতে পারলো। এটা জানা হয়ে গেলেই, সব জানা শেষ হয়ে গেল। বুঝতে পারলে? তখন আর কোন প্রশ্নই থাকবে না। বুঝতে পেরেছ? আচ্ছা, আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন ডট কম্

www.avinabadarshan.com

অভিনব দর্শন ডট কম্ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে Web দুনিয়ায়। এই Website-টি জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্বময় কর্মজীবন ও বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই Website-টি বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের অন্তর্গত ১০-১২টি সংগঠন বা কোন ট্রাষ্টের official site নয়। এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে কিছু ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইদের ব্যক্তিগত কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত ও পরিবেশিত। এই Website-টি সম্পূর্ণ মুক্ত এর জন্য কোন Donation বা অনুদান গ্রহণ করা হয় না।

আমাদের দেশে হাজার হাজার বছর আগে বেদের যুগে যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ অশ্রুতপূর্ব তত্ত্ব ও তথ্য প্রাঞ্জল ভাষায় উদ্ঘাটন করেছেন। বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তির দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন পূর্ণত্বে, ব্যাপ্তিত্বে, বস্তুনিষ্ঠায় যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা সৃষ্টির ধারার মত সাবলীল, স্বচ্ছ ও সর্বজনগ্রাহ্য, সেই আদিবেদের সঙ্গে অধুনা প্রচলিত সাম্যবাদের কোথায় কোথায় সাদৃশ্য এবং কোথায় কোথায় পার্থক্য তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন।

এই Website-এর উদ্দেশ্য হলো, আদিবেদের প্রকৃত তত্ত্ব দর্শনকে তুলে ধরে সমাজকে জাগিয়ে তোলা। বেদের তত্ত্বকে আশ্রয় করে ধর্মনীতি, রাজনীতি, মন্ত্রতন্ত্র ও দেবদেবী সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যানধারণা গুলির প্রকৃত বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা এবং সমাজের বুকে সেই আদর্শের সার্থক রূপায়নের মাধ্যমে সমাজকে গড়ে তোলা এবং সমাজে জনজাগরণ ঘটানো। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায়, ''জনচেতনা প্রথমে আন কলমে, কামানে নয়। ন্যায়, নিষ্ঠা, সত্যের সেই কলম চালিয়ে যাও।'' তাই লেখনির মাধ্যমে আদিবেদের তত্ত্ব, দর্শন ও আদর্শ প্রচার করা আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

বেদনীতিই হলো জীবনীতি — জীবের সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতি — যা আজকের সমাজ প্রায় বিস্মৃত। আমাদের কাজ হলো, বেদনীতি প্রচারের মাধ্যমে সমাজে জনজাগরণ করা। বেদের যুগের শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি আবার ফিরে আসুক, এটাই হলো আমাদের মুখ্য কামনা। তাই আদিবেদের বিজ্ঞান ভিত্তিক তত্ত্বের আলোকধারাকে সকলের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেবার দায়িত্ববোধে আমাদের এই Website অভিনব দর্শন ডট কম্।

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ এসেছেন ইতিহাসের ধারায়, জন্ম থেকেই প্রকৃতির নিজস্ব সুর নিয়ে। তাই অষ্টসিদ্ধিতে তাঁর জন্মগত অধিকার। সেইজন্যই বাস্তবের কোন মাপকাঠি দিয়ে তাঁর বিচার করা চলে না। নিজ নিজ উপলব্ধির স্তর বা মাত্রা থেকে তাঁকে বুঝতে হবে। তাই আমাদের প্রিয় Viewer-দের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামতকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

অভিনব দর্শন ডট কম্-এর পক্ষে
চপল মিত্র

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

	পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭)	বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮)	শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯)	তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০)	দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১)	পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২)	অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩)	বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪)	সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫)	পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬)	জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭)	মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮)	আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯)	কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০)	জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১)	তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২)	মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩)	পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪)	চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫)	মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬
২৬)	সাধু হও সাবধান	শুভ মহালয়া, ১৪১৬
২৭)	লং পাহাড়ের ডায়েরী	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬
২৮)	বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯
২৯)	যত্র জীব তত্র শিব	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৬
৩০)	ম্যাসেঞ্জার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৭
৩১)	আলোর পথিক	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৭
৩২)	নাদ ব্রহ্ম	শুভ রাখী পূর্ণিমা, ১৪১৭
৩৩)	বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৭
৩৪)	চিন্তন	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১০

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫